আলোরপথ

১ম সংখ্যা, ১ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ২৯ শাবান ১৪৪৩ হিজরী

কুরআন অধ্যয়নের সোপান

ফিকহুস সিয়াম-রোজার মাসায়েল

মাহে রামাদ্বান সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিলের নয় দফা কর্মসূচি

আলোরপথ

১ম সংখ্যা, ১ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ২৯ শাবান ১৪৪৩ হিজরী

উপদেষ্টামণ্ডলী

মোসলেহ ফারাদী
হামিদ হোসাইন আজাদ
নূরুল মতীন চৌধুরী

সম্পাদক

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সম্পাদনা সহযোগী

মোসাদ্দেক আহমেদ
সৈয়দ তোফায়েল হোসেন

রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স

আবু ইহসান
মাহবুবুল আলম সালেহী

পাবলিকেশন্স সহযোগী

জামিল মাহমুদ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

ইউসুফ ইসলাম

প্রকাশকাল

এপ্রিল : ২০২২

প্রকাশনায়

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)
3rd Floor Business Wing
38-44 Whitechapel Road
London E1 1jx
www.mcasite.org
Alor Poth Contact: alorpoth@mcasite.org

সূচিপত্র

তাকওয়ার অনুশীলনই রামাদ্বানের প্রধান উদ্দেশ্য ০৫
অধ্যক্ষ এস এম সানাউল্লাহ

রামাদ্বানই তাকওয়ার উত্তম পদ্ধতি ০৮
হাফেজ মাওলানা নূর হোসাইন

কুরআন অধ্যয়নের সোপান ১৫
মোসলেহ ফারাদী

ফিকহুস সিয়াম-রোজার মাসায়েল ২০
শায়খ আব্দুল কাইয়ুম

মাহে রামাদ্বান থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিলের নয় দফা কর্মসূচি ২২
হামিদ হোসাইন আজাদ

দাওয়াতী কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করণ ও অন্যদেরকে মোটিভেট বা উৎসাহিত করার পদ্ধতি ২৮
নুরুল মতীন চৌধুরী

রামাদ্বান আত্মগঠন পরিবার ও সংগঠন উন্নয়ন ৩৩
মামুন আল আযামী

রামাদ্বান পরবর্তী করণীয় ৩৬
মুহাম্মদ আবুল হোসাইন খান

জাতিসত্তা বিকাশে কুরআন : আমাদের করণীয় ৪০
ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম আজাদী

এবারের মিরাজে প্রাসঙ্গিক ভাবনা ৪৬
ডা. মুহাম্মদ আমিন

জিহ্বা ও ভাষার নিয়ন্ত্রণ: সিয়াম থেকে শিক্ষা ৫১
আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

ইউরোপে রামাদ্বানের স্মৃতি ৬০

পবিত্র রামাদ্বান উপলক্ষ্যে এমসিএ সভাপতির আহ্বান ৬৫

সংগঠন সংবাদ ৬৭

সম্পাদকীয়

আহলান সাহালান- মাহে রামাদান

সবাইকে রামাদান মুবারাক। যুক্তরাজ্যে প্রথম রোজা ২ এপ্রিল ২০২২ থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে।

পবিত্র রমজান মাসে আল কোরআন নাজিল হয়েছে ফলে রমজান মাস বছরের অন্য মাসের তুলনায় অতিব সম্মানিত । আর এই মাসে এমন রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। পবিত্র এই মাসে সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পাপ পঙ্কিলতা দূর করে পরিশুদ্ধতা অর্জন ও সর্বোপরি নিজের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়ে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা প্রতিটি ঈমানদারের কর্তব্য। আমরা যদি রমজানের শিক্ষা কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে মুত্তাকীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে রমজানের শিক্ষা প্রতিফলিত হবে।

কভিড-১৯ মহামারির পর, ইউরোপে জীবনযাত্রার ব্যায় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। সব ধরনের জ্বালানীর দামও উর্ধ্বগামী। দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার উর্ধ্বগতির সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব মুসলিম পরিবারগুলোর ওপর পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ নৃতাত্ত্বিক এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মাঝেই দারিদ্রতার হার সবচেয়ে বেশি।

ইউক্রেন ছিল পৃথিবীর জন্য খাবারের বাক্সের মতো। আটা, ময়দা, ইস্ট, তেল এবং অন্যান্য খাবারের জোগান দিতো দেশটি। চলমান যুদ্ধের কারণে এই খাবারগুলোর সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় গোটা বিশ্বজুড়ে মুসলিমরা রামাদানের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে চরম বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে।

ইউক্রেনের যুদ্ধটি আরেকবার প্রমাণ করেছে যে, শাসকেরা কতটা বর্বর ও আগ্রাসী হতে পারে এবং তাদের এই সশস্ত্র কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে কত অসংখ্য মানুষের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসতে পারে। ইউরোপে বর্তমানে ঠিক এই বাস্তবতাই দেখা যাচ্ছে। আমরা একইসাথে ইউক্রেন থেকে আসা উদ্বাস্তুদের প্রতি পশ্চিমা দেশগুলোর মহানুভবতা এবং ব্যাপক উদারতাও পর্যবেক্ষন করছি। হাজার হাজার বৃটিশ নাগরিক ইউক্রেন থেকে আসা অগনিত উদ্বাস্তুদেরকে নিজেদের মাঝে বরণ করে নিয়েছে। সরকারও অভিবাসন সংক্রান্ত আইন শিথিল করছে। এগুলো নি:সন্দেহে মানবিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা ইরাক, সিরিয়া বা আফগানিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে দেখতে পাইনি। কিছু আফগান নাগরিক মার্কিন বিমানে চড়ে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে যাওয়ার সময় পিষ্ট হয়ে মারা গেছে। অনেক উদ্বাস্তু নারী ও শিশু বৃটেনে প্রবেশের জন্য দিনের পর দিন সাগরে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছে। অথচ প্রতিটি উদ্বাস্তুরই নিজ নিজ ধর্ম ও জাতীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে ওঠে মানবিক সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই বর্বর যুদ্ধে আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। তাই আসন্ন পবিত্র রামাদান মাসে আমরা আল্লাহর কাছে বিশ্বমানবতার জন্য রহমত কামনা করে দুআ প্রার্থনা করবো। সব ধরনের যুদ্ধ ও সহিংসতার অবসান ও মানবিক দুর্ভোগের পরিসমাপ্তির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবো। আল্লাহ যেন বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে দেন।

ইউরোপে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষীদেরকে কুরআন- সুন্নাহর আলোতে উদ্ভাসিত ব্যক্তি ও সমাজ জীবন গঠনে দিক নির্দেশনা দানের উদ্দেশ্যে "আলোর পথ" প্রকাশিত হত। কিন্তু প্রায় এক যুগের বেশী সময় ধরে তা নানা কারণে বন্ধ ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘদিন পর আলোর পথ আবার প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আল্লাহর শুকরিয়া, নানা সীমাবদ্ধতা সত্বেও পবিত্র রামাদান মাসের শুরুতেই আবারও আলোর পথ আলোর মুখ দেখছে। আমাদের প্রত্যাশা 'আলোর পথ' ইউরোপে দাওয়াত, তানযীম, তারিবয়াহ, আদল ও বির এর কাজ সম্প্রসারণে আলোক বর্তিকা হিসাবে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ। এই ক্ষেত্রে লেখক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিক পরামর্শ কামনা করছি। লেখক ও প্রকাশের সাথে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এটি প্রকাশের জন্য যারা লেখা, পরামর্শ, শ্রম, সময় ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদের আখিরাতে মুক্তির উছিলা হিসেবে আলোর পথকে কবুল করুন। আমিন।

কেন্দ্রীয় সভাপতির বানী

ফিরে এলো আলোর পথ

মাসিক আলোর পথের কথা হয়তো অনেকের মনে আছে যা অনেককে লিখতে বাধ্য করেছিলো সমাজ পরিবর্তনে লেখকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি। মনে আছে আব্দুল লতিফ ভাইয়ের কথা। আমার লেখার প্রতি আগ্রহ ছিল কিন্তু সময়ের অগ্রাধিকার ছিলো অন্যদিকে অর্থাৎ সংগঠন পরিচালনার দিকে। তারপরও আব্দুল লতিফ ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে মাসে আমাকে একটি লিখা দিতে হতো। বোধ করি এ ছিলো অন্য অনেক লেখকের বেলায়াত্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আলোর পথের সামনে অন্ধকার নেমে আসলো। আলোর পথ বন্ধ হয়ে গেল। আলোর পথের অনেক পাঠক ছিলেন এবং ছিলেন অনেক গুণগ্রাহী। চিন্তার পরিশুদ্ধি ও তারবিয়াহ ক্ষেত্রে মাসিকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। আলোর পথ চলতে থাকলে অনেক উপকার হতো সন্দেহ নেই।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'য়ালার অপার অনুগ্রহে আব্দুদ্দাইয়ান মোহাম্মদ ইউনুস এবার এগিয়ে এলেন লণ্ঠন হাতে করে আলোর পথ আবার সূর্যের মুখ দেখলো। তিনি হয়ত আবার লেখকদের উপর চড়াও হবেন। অনেক নতুন লেখক তৈরি হবে, ইনশাআল্লাহ। আশাকরি আলোর পথ আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে আলোকিত করবে। আবার আমাদের নতুন প্রজন্মের সামনে যে অন্ধকার তা দূর করার জন্য পুরাতন প্রজন্মের ভূমিকার যে অপ্রতুলতা তা আলোর পথ দূর করবে। বাংলা ভাষায় প্রকাশনা ব্যতীত পুরাতন প্রজন্মকে আলোকিত করা সম্ভব নয়, তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। পুরাতন প্রজন্ম যদি অন্ধকারে থাকে তাহলে নতুন প্রজন্ম কিভাবে আলোকিত হবে ?

যাঁরা আলোর পথের পুনরুজ্জীবনে এগিয়ে এসেছেন তাদের প্রচেষ্টা আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। তাঁদের নেক নিয়াতে বরকত দান করুন। যাঁদের হাতে আলোর পথ পৌঁছবে তাঁদের সবার প্রতি আবেদন থাকবে যে আপনি নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়ান, নিজে লিখুন অন্যকে লিখতে বলুন, নিজে পরামর্শ দিন এবং অন্যকে পরামর্শ দিতে বলুন। চলুন সবাই মিলে আলোর পথে চলি। আলো দেখি এবং অন্যকে আলো দেখাই। আল্লাহ তায়ালা আলোর পথের সহায় হোন আমিন।

মোসলেহ ফারাদী

২৮/০৩/২০২২

তাকওয়ার অনুশীলনই রামাদ্বানের প্রধান উদ্দেশ্য

অধ্যক্ষ এস এম সানাউল্লাহ

يا أيها الذين آمنوا كتب عليك الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون(٣٨١)
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر و على اللذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ان تصموا خير لكم ان كنتم تعلمون (٤٨١)

(সুরা আল বাক্বারাহ ১৮৩-১৮৪ আয়াত)

সরল অনুবাদঃ

(১৮৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বসূরিদের ওপর, যেনো তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করতে পারো।

(১৮৪) নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের জন্যে। তবে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময়ে সমসংখ্যক দিন রোজা রাখবে। আর যাদের জন্যে (রোজা) একান্ত কষ্টকর হবে তারা ফিদিয়া (বিনিময়) অর্থাৎ একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান করবে। আর যদি কেউ আনন্দ চিত্তে আরো বেশি সৎকর্ম করে, তবে তা তার জন্যে অতিরিক্ত কল্যাণ বয়ে আনবে। তবে রোজা রাখা তোমাদের জন্যে সবচেয়ে বেশি কল্যাণের, যদি তোমরা জানতে!

পটভূমি

নামকরণঃ আলোচিত আয়াতগুলো কুরআনে কারীমের ২ নং সুরা আল বাকারা থেকে চয়ন করা হয়েছে। সুরার ৬৭ নং আয়াতে উল্লেখিত বাকারা শব্দ থেকে এই নামকরণ করা হয়েছে। এটি আল কুরআনের বৃহত্তম সুরা। এর আয়াত সংখ্যা ২৮৬, রুকু সংখ্যা ৪০। এটি মাদানী সুরা।

নাযিলের সময়কালঃ মহানবী (সা.) এর হিজরতের পরপরই সুরাটির বেশি অংশ নাযিল হয়। আজকের আলোচিত আয়াত দুটো হিজরী দ্বিতীয় সনের রামাদ্বান মাসে নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয়ঃ

এখানে ইসলামের ৫টি মৌলিক ভিত্তির অন্যতম রোজা বা সাওমের বিধান ও ফযিলত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা

বাক্বারাহ ১৮৩ আয়াতে রোজাকে ফরয করার পাশাপাশি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যুগে যুগেই রোজার বিধান বিদ্যমান ছিলো। রোজার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কথাও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

রোজার পরিচয়ঃ

রোজা শব্দটি ফারসি। এর আরবী প্রতিশব্দ তথা কুরআনের ভাষা হলো আস সাওম। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আত্মসংযম, কঠোর সাধনা, বিরত থাকা ইত্যাদি। এর প্রতিশব্দ আল ইমসাক। ইংরেজি ভাষায় বলে Fasting।

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় বলা যায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সাওমের নিয়্যাতে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোজা। আর মাস হিসেবে রামাদ্বান হলো হিজরী সালের নবম মাস। আরবী রামদ (رمض) শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। রামদ শব্দের অর্থ জ্বালিয়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের করা পাপাচারকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেওয়াই রামাদ্বানের উদ্দেশ্য।

পূর্ববর্তী উম্মতদের রোজা:

হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়্যামে বীযের রোজা রাখা হতো। প্রাচীনকালে রোমান ও ব্যবিলনীয়দের মাঝেও রোজা প্রচলিত ছিলো।

পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মেই কোন না কোন রকমের উপবাস ব্রত পালনের বিধান রয়েছে। ইহুদীরা প্রতি শনিবার এবং আশুরার দিনে রোজা রাখতো। মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে অবস্থানের ৪০ দিন রোজা পালনের নির্দেশ ছিলো। খ্রিস্টানদের ৫০ দিন রোজা পালনের রেওয়াজ ছিলো। হিন্দুধর্মে একাদশী উপবাস পালন করা হয়। বৌদ্ধদের পুরোহিত ও ভিক্ষুগণ বিভিন্ন চীবর অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলক উপবাস পালন করেন। পারসিকরা এগারো দিন, কেউ কেউ ৩ দিন আবার কেউ তেত্রিশ দিন পর্যন্ত রোজা রাখেন। বৈদিক হিন্দুরা একাদশী ছাড়াও এদের বিধবারা আমাবস্যা-পূর্ণিমায় উপবাস পালন করেন।

অবশ্য মর্যাদা ও মহিমা বিচারে রোজার সাথে অন্য কোন উপবাসের তুলনাই চলে না। রোজার মাঝে আবার সেরা হলো মাহে রামাদ্বানে নর রোজা।

রোজা ফরযের উদ্দেশ্য:

রোজা ফরযের মূল উদ্দেশ্যই হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন। তাকওয়ার ব্যাখ্যা সম্পর্কে একদা হযরত ওমর ((রা.)) উবাই ইবনে কাব ((রা.)) কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আপনি কি কখনো কন্টাকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন? ওমর ((রা.)) বললেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনে কাব (রা) পূনরায় প্রশ্ন করলেন, তখন আপনি কিভাবে পথ চলেছেন? জবাবে ওমর ((রা.)) বলেন, আমি সাবধানতা অবলম্বন করে দ্রুত গতিতে ঐ পথ অতিক্রম করেছি। উবাই ইবনে কাব বলেন, এটাই তাকওয়া।

যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাকে বলে মুত্তাকী। তাকওয়া হলো ইসলামী নৈতিকতার তৃতীয় স্তর। তাকওয়া শব্দটি وقاية শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো বাঁচা, আত্মরক্ষা করা, নিষ্কৃতি পাওয়া ইত্যাদি।

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাবতীয় অপরাধ, অন্যায় ও অপছন্দনীয় কথা, কাজ ও চিন্তা থেকে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নাম হলো তাকওয়া।

এই তাকওয়ার অনুশীলনই রোজার প্রধান উদ্দেশ্য।

সুতরাং রোজা রেখেও আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন থেকে বিরত থাকতে না পারলে সেই রোজা হবে নিষ্ফল। মহানবী (স) বলেছেন-

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى ان يدع طعامه وشرابه -

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং কাজ পরিহার করল না, তার খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।
(বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও আহমাদ)

তাই অমরা যে আল্লাহর ভয়ে রোজাকালীন সময়ে খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকি সে আল্লাহকে ভয় করে যাবতীয় হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখাই রোজার প্রধান প্রশিক্ষণ। একমাসের কঠোর প্রশিক্ষণ ধারণ করে সারা বছর এর বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

(আয়াত নং : ১৮৪)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা রোজার কিছু বিধি বিধান বর্ণনা করেছেন এবং রোজাকে আমাদের জন্য কল্যাণকর বিষয় হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

মেহেরবান আল্লাহ তার বান্দাদের উপর কঠিন কিছু চাপিয়ে দিতে চান না। তাই ফরয রোজাকে বছরের একটি মাসে সীমিত করা হয়েছে। তাও আবার মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট দিনের পরিবর্তে পরে সুবিধাজনক যে কোন সময়ে কাযা করে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আর রোজা ফরয করার প্রথম বছর রোজার পরিবর্তে ফিদয়া দেওয়ার সুযোগও রেখেছিলেন। পরবর্তী বছর থেকে অবশ্য সক্ষম ব্যক্তিদের রোজার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদানের বিষয়টি রহিত করে দেওয়া হয়েছে। তবে অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তিরা রোজার কাযা করবেন।

রমযানের ফযিলত ও কল্যাণসমূহ

রোজার প্রতিদান:

হাদিসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

قال الله عز و جل كل عمل إبن ادم له إلا الصيام فانه لى و انا اجزى به -

মহান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্যে, কেবল রোজা ছাড়া। কারণ রোজা আমার জন্যে এবং এর প্রতিদান আমি নিজে দেবো।

(বুখারী, মুসলিম)

ক্ষমার ঘোষণা:

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه -

হযরত আবু হুরায়রা ((রা.)) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে লোক রমজান মাসে ঈমান ও সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করে, তার আগের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।

(বুখারী)

জান্নাতের দরজা খোলা:

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة غلقت أبواب النار و صفدت الشياطين -

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রামাদ্বান মাস আসলে জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকলে বন্দী করা হয়।(মুসলিম)

এভাবে রোজার অগণিত কল্যাণের কথা কুরআন ও মহানবী (সা.) এর বাণীতে বর্ণনা করা হয়েছে।

আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে নানাবিধ জটিল রোগ থেকে মুক্তি এবং সুস্থ ও সুন্দর দেহ-মন তৈরির জন্য রোজার ভূমিকা প্রথম কাতারেই।

সবকিছু মিলিয়ে নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা যায়, প্রকৃতই রোজা আমাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর একটি বিধান।

শিক্ষণীয় বিষয়:

আলোচিত আয়াত দুটো থেকে আমরা যে শিক্ষাগুলো পাই-

১. পূর্ববর্তী সব নবী রাসূল এবং তাদের উম্মতদের উপরও সিয়ামের বিধান ছিলো।

২. সিয়াম ফরয করার মূল উদ্দেশ্যই হলো তাকওয়া অর্জন।

৩. রোজার বিধানকে আল্লাহ আমাদের জন্য কঠিন করে দেননি।

৪. সারা বছরে মাত্র একমাস রোজা ফরয করা হয়েছে, এর প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৫. রমজানকে প্রশিক্ষণ মাস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৬. রোজা সবদিক থেকেই আমাদের জন্য কল্যাণকর একটি বিধান।

(লেখক: শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ)

রামাদ্বানই তাকওয়ার উত্তম পদ্ধতি

হাফেজ মাওলানা নূর হোসাইন

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় ইমানসহ রামাদ্বানের সিয়াম পালন করবে তথা রোজা রাখবে তার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বুখারী-৩৮, মুসলিম-১৬৬৬)

হাদিস প্রসঙ্গ

আলোচ্য হাদিসটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। অত্র হাদিসে রাসূল (সা.)সিয়াম তথা রোজা এবং সিয়াম পালনকারী তথা রোজাদারের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

সনদ

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদিসটি ইবনুস সালাম থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনু ফুযাইল থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি আবু সালামা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অপরদিকে ইমাম মুসলিম (রহ.) হদিসটি যুহাইর বিন হারব থেকে, তিনি মুয়াজ বিন হিশাম থেকে, তিনি তার পিতা হিশাম থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে কাসির থেকে, তিনি আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি আবু হুরায়রা ((রা.)) থেকে বর্ণনা করেছেন।

রাবী পরিচিতি

নাম আব্দুল্লাহ বা আব্দুর রহমান, উপাধি আবু হুরায়রা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাম ছিল আব্দুশ শামস বা আবদে আমর। পিতা সাখর, মাতা উম্মিয়া বিনতে সাফীহা বা মায়মুনা। ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে নবুওয়াতের ১৪ বছর পূর্বে দক্ষিণ আরবের দাউস গোত্রে কারো মতে আযাদ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রি. সপ্তম হিজরী সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। আসহাবে সুফ্ফার সদস্য সাহাবি খায়বারসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সর্বাধিক (৫৩৭৪) হাদিস বর্ণনাকারি সাহাবি। ৬৭৩ খ্রি. মোতাবেক ৫১ হিজরীতে ৭৮ বছর বয়সে মদীনার অদূরে কসবা নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করলে, হযরত ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা ((রা.)) এর ইমামতিতে জানাযা শেষে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।

হাদিসের ব্যাখ্যা

নির্বাচিত দারসে হাদিসটিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। সরল অনুবাদ থেকে আমরা এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)মাহে রামাদ্বান, সিয়াম এবং সিয়াম পালনকারীর গুরুত্ব, মর্যাদা ও পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হাদিসটির বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও এর মর্মার্থ অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থসমূহে রোজা ও রামাদ্বানের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা এসেছে। রোজা, রোজাদার এবং রামাদ্বানের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত অত্র হাদিসের অন্তর্নিহিত সার উপলব্ধি করতে হলে এ সংক্রান্ত অপরাপর আয়াত ও হাদিসসমূহ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

বরকতময় রামাদ্বান

মাহে রামাদ্বান অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ ও বরকতময় মাস। এটি রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও নাজাতের সওগাত নিয়ে আমাদের মাঝে বছরে একবার হাজির হয়। আল-কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় এ

মাসের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্বের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ

রামাদ্বান মাস, যে মাসে আল-কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে। (সুরা বাক্বারা-১৮৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, রামাদ্বান মাস আসলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকলে বন্দী করা হয়। (মুসলিম-২৩৮৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শয়তান ও দুষ্ট জ্বিনদেরকে রামাদ্বান মাসের প্রথম রাতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এর একটি দরজাও আর খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং এর একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। এ মাসের একজন ঘোষক ঘোষণা দিতে থাকেন, হে কল্যাণ অন্বেষণকারী, অগ্রসর হও, হে পাপাসক্ত, বিরত হও। আর বহু লোককে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে এ মাসে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রতিমাসেই এরূপ হতে থাকে। (তিরমীজি- ৬৮২, ইবনে মাজাহ-১৬৪২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের নিকট রামাদ্বান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অত্র মাসের সওম ফরয করেছেন। এ মাসের আগমনে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সে প্রকৃত বঞ্চিত রয়ে গেল। (নাসায়ী- ৬০১২)

আলোচ্য হাদিসসমূহে রাসূল (সা.)রামাদ্বান মাসের যে ফজিলত ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন তা সত্যি অতুলনীয়। এ মাসে আল্লাহ তা'য়ালা তার অবারিত রহমত ও নাজাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়ে তার নৈকট্য হাসিলের সুবর্ণ সুযোগ আমাদের জন্য তৈরী করে দিয়েছেন। পাপিষ্ট, সীমালঙ্ঘনকারী, শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করে মানুষের পাপাচারের পথ বন্ধ করে আমাদের জান্নাতে যাওয়ার পথকে সুগম করেছেন। এ মাসের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে রাসূল (সা.) আরও বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُعْطِيَتْ أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهُ أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا ، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ ، فَلا يَخْلُصُونَ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ فِيهِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمُؤْنَةَ وَالأَذَى ، وَأَنْ يَصِيرُوا إِلَيَّ ، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ قَالَ لا ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يُوَفَّى الْعَامِلُ أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.)বলেছেন, রামাদ্বান মাসে আমার উম্মতকে পাঁচটি নিয়ামত দান করা হয়েছে যা আগের উম্মতকে দেওয়া হয়নি। রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের চেয়েও বেশি ঘ্রাণযুক্ত, ইফতার পর্যন্ত সায়িমের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করেন, রোজাদারের জন্য প্রতিদিন জান্নাতকে সজ্জিত করা হয় এবং শয়তানকে বন্দি করা হয়। রামাদ্বানের শেষ রাতে সকল উম্মতকে মাফ করা হয়। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কি ক্বদরের রাত্রি? তিনি বললেন, না! তবে শ্রমিকের প্রাপ্য তার কাজের শেষেই দেওয়া হয়। (মুসনাদে আহমাদ-১৬/১১৭)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন আনসারি মহিলাকে বলেছিলেন, যখন রামাদ্বান এসে যাবে তখন তুমি একটি উমরাহ আদায় করবে। কেননা রামাদ্বানের একটি উমরাহ একটি হজ্জের সমপরিমাণ। (নাসায়ী-২১১০)

এমনকি যে রাত্রিতে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন সে রাতকেও অন্যান্য রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ফলে সে একটি

রাত্রি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে আমরা রামাদ্বানের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানতে পারলাম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য এ মাসে এমন সকল নেয়ামত রেখেছেন, যা অন্য মাসে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া এ মাসে মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদী (সা.)কে এমন সকল সম্মানে ভূষিত করেছেন, যে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব অতীতের কোন নবি রাসূলের উম্মতকে আল্লাহ দান করেননি।

সিয়ামের ফযিলত ও গুরুত্ব

মহান আল্লাহ তায়ালা মাহে রামাদ্বান মাসকে যেভাবে সম্মানিত করেছেন, ঠিক তদ্রুপ এ মাসের ফরজ ইবাদত রোজাকেও অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ করেছেন।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মানব সন্তানের যাবতীয় কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু সিয়াম! এটা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। সেই মহান সত্তার শপথ, যার মুঠোয় মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয়ই সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়। (মুসলিম-২৫৯৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الصِّيَامُ جُنَّةٌ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, সিয়াম ঢাল স্বরূপ। (মুসলিম-২৫৯৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقث يومئذا ولا يسخب. فإن سابه أحدا أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، يوم القيامة، من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব দশগুন থেকে সাতশগুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য কিন্তু সিয়াম বিশেষ করে আমার জন্যই রাখা হয়। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। সুতরাং যখন তোমাদের কারো সওমের দিন আসে সে যেন ঐ দিন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে বিবাদ করতে চায়, সে যেন বলে, আমি একজন সিয়াম পালনকারী। সে মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! সিয়াম পালনকারীদের মুখের দুর্গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও উত্তম হবে। আর সিয়াম পালনকারীদের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। এর মাধ্যমে সে অনাবিল আনন্দ লাভ করে। একটি হলো যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারীর মাধ্যমে আনন্দ পায় আর দ্বিতীয়টি হলো যখন সে তার প্রভুর সাথে মিলিত হবে তখন সে তার সিয়ামের জন্য আনন্দিত হবে। (মুসলিম-২৫৯৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুইবার বলে, আমি রোজাদার। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুন। (বুখারী, ১৮৯৪)

উদ্ধৃত হাদিসসমূহ থেকে আমরা সিয়াম বা রোজা এবং রোজাদারের অতুলনীয় সম্মান মর্যাদা ও পুরস্কারের কথা অবগত হয়েছি। দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোন সম্মানী ব্যক্তির নিকট হতে পুরস্কার নেয়ার প্রতি মানুষের অত্যন্ত আগ্রহ তৈরী হয়। এসব সম্মানী ব্যক্তির নিকট থেকে পুরস্কার নিতে পারলে মানুষ নিজেকে কতইনা সৌভাগ্যবান মনে করে। পক্ষান্তরে এ পুরস্কারের ঘোষক হচ্ছেন অথবা স্বয়ং নিজেই পুরস্কার হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা। বিষয়টি কতই না মর্যাদাপূর্ণ, কতই না গৌরবের! কিয়ামতের দিন এই পৃথিবীর সকল রাজাধিরাজের শ্রেষ্ঠ রাজাধিরাজ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বয়ং নিজ

হাতে সিয়াম পালনকারীর পুরস্কার দিবেন। অবশ্য এ পুরস্কারের তুলনা দুনিয়ার কোন পুরস্কারের সাথে হয় না। সুতরাং এটি অতুলনীয় পুরস্কার।

সিয়াম পালনের মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জিত হয়

সিয়াম তথা রোজা আমাদের মত অন্যান্য নবি রাসূলদের উম্মতের উপরও ফরয ছিল। এ ইবাদতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো খোদাভীতি তথা তাক্বওয়া অর্জন করা। মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ইমানদারগণ!, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পারো। (সুরা বাক্বারা-১৮৩)

হযরত আদম (আ.) এর রোজা: বছরে ৩০টি রোজা ফরজ ছিল। (ফাতহুল বারী, ৪র্থ খন্ড ১০৩ পৃ.)

নূহ আ. এর রোজা: ১লা শাওয়াল ও ১০ জিলহজ্জ ছাড়া সারা বছর রোজা রাখতেন। (ইবনে মাজাহ ১২৪ পৃ.)

ইবরাহিম (আ.) এর রোজা: ৩০টি রোজা ফরজ ছিল।

দাউদ (আ.) এর রোজা: একদিন রোজা রাখতেন ও একদিন পানাহার করতেন। (নাসায়ী ১ম/২৫০)

ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ.) এর রোজা: তারাও তাদের উম্মতদের রোজার নির্দেশ দিয়েছেন। (মার্কস: ২-১৮)

সিয়াম ইসলামের অন্যতম রুকন

ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম রুকন হলো সিয়াম তথা রোজা পালন করা। হাদিসে এসেছে

عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের উপর দণ্ডায়মান। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লায় হজ্জ করা ও রমাদ্বানে রোজা রাখা। (বুখারী- ৮)

রোজাদারের মর্যাদা: মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে রোজাদারের মর্যাদা অনেক বেশি। তাদের জন্য থাকবে জান্নাতে প্রবেশের আলাদা পথ। যে দরজা শুধু তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। হাদিসে এসেছে-

عن سهل ابن سعد قال قال رسول الله ﷺ إن في الجنة بابا يقال له الريان. يدخل منه الصائمون يوم القيامة. لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال أين الصائمون ؟ فيدخلون منه. فإذا دخل آخرهم. أغلق فلم يدخل منه أحد

হযরত সাহল ইবনু সা'দ (রা.) বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, জান্নাতে 'রাইয়ান' নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে সিয়াম পালনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সিয়াম পালনকারীগণ ছাড়া অন্য কেউ তাদের সাথে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারীদের ডেকে বলা হবে, সিয়ামপালনকারীরা কোথায়? তখন তারা সে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর সিয়াম পালনকারীদের শেষ লোকটি প্রবেশ করার সাথে সাথে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। অতঃপর সে দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম-২৬০০)

অন্য হাদিসে এসেছে,

من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا

আর যে ব্যক্তি সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে পানি পান করবে। আর যে পানি পান করবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। (নাসায়ী-২২৩৬)

রোজা জাহান্নামকে দূরে সরিয়ে দেয়

রোজা রাখার কারণে জাহান্নাম তার থেকে দূরে সরে যাবে। রাসূল (সা.)বলেন-

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النارسبعين خريفا

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধের সময়) একদিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার চেহারাকে এ দিনের (সিয়ামের) বারাকাতে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন। (মুসলিম-২৬০১)

عن عثمان بن ابى العاص قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الصوم جنة من النار كجنة احدكم من القتال

উসমান ইবনে আবিল আস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, সাওম জাহান্নামের অগ্নি থেকে ঢাল স্বরূপ, তোমাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়। (নাসায়ী-২২৩১)

রোজা কাফফারা স্বরূপ

عن حذيفة قال قال عمر من يحفظ حدثا عن النبي ﷺ في الفينة قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة

হযরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা ওমর (রা.) বললেন, ফিতনা সম্পর্কিত নবী (সা.)এর হাদিসটি কার মুখস্ত আছে? হুযাইফা (রা.) বললেন, আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, পরিবার, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশীই মানুষের জন্য ফিতনা। সালাত, সিয়াম এবং সদকা এর কাফফারা হয়ে যায়। (বুখারী-১৮৯৫)

সওম প্রবৃত্তি দমনকারী

عن علقمة قال بينا أنا أمشي مع عبدالله فقال كنا مع النبي ﷺ فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

হযরত আলকামাহ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ (রা.) এর সঙ্গে চলতে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (সা.)এর সাথে ছিলাম, তিনি বললেন, যে ব্যক্তির সামর্থ আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ নেই, সে যেন সওম পালন করে। সওম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে।(বুখারী-১৯০৫)

সাহরীতে রয়েছে বরকত

সওম তথা রোজা যেমন ফজিলতপূর্ণ ইবাদত পাশাপাশি তার সংশ্লিষ্ট সকল আমলই বরকতপূর্ণ। রোজার জন্য সাহরী গ্রহণ করাও তেমনি একটি বরকতপূর্ণ আমল। হাদিসে এসেছে-

عن أنس بن مالك قال قال النبى ﷺ تسحروا فإن في السحور بركة

আনাস ইবনু মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী (সা.)বলেছেন, তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে।

(বুখারী-১৯২৩)

عن عبدالله بن الحارث يحدث عن رجل من اصحاب النبى ﷺ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال انها بركة اعطاكم الله اياها فلا تدعوه

আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)এর জনৈক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে গেলাম যখন তিনি সাহরী খাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন যে, এতে বরকত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা এ বরকত তোমাদেরকেই দান করেছেন। অতএব তোমরা একে ছাড়বে না। (নাসায়ী-২১৬২)

রমাদ্বানে আমাদের করণীয়

উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা রামাদ্বান মাসকে আলাদা ও বিরল মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। পাশাপাশি রোজার জন্য অতুলনীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা এ মর্যাদাপূর্ণ মাসে আমাদের করয় ণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করব।

সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা

রামাদ্বান ইবাদত ও বরকতের মাস। এ মাসের ইবাদতকে আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। তাই এ মাস আসার পূর্বে আমাদের উচিত ইবাদত বন্দেগীর জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা। দুনিয়াবি অন্যান্য কাজ কমিয়ে কীভাবে বেশি বেশি আল্লাহর গোলামি করা যায় সেভাবে আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এমনকি প্রিয় নবীজি (সা.)নিজেও শা'বান মাস থেকে রমজান মাসের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। قال رسول الله ﷺ احصوا هلال شعبان لرمضان রাসূল (সা.)বলেন, তোমরা রামাদ্বানের উদ্দেশ্যে শা'বানের চাঁদের হিসাব রাখো। (তিরমিযী)

এমনকি রাসূল (সা.)শা'বান মাসে বেশি বেশি সওম পালন করে নিজেকে রামাদ্বান মাসের জন্য প্রস্তুত করতেন।

عن عائشة قالت ما رأيته بعد شهر رمضان اكثر صياما منه في شعبان كان يصومه كله الا قليلا

আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে রামাদ্বান ব্যতিত শা'বানের চেয়ে আর কোন মাসে এত বেশি রোজা রাখতে দেখিনি। তিনি অল্প কয়দিন ছাড়া পুরো শা'বান মাসে রোজা রাখতেন। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

রমাদ্বানে রোজা পালন করা

রামাদ্বান মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো পুরো মাস রোজা রাখা। এটি আমাদের জন্য ফরয ইবাদত এবং ইসলামের অন্যতম রুকন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পারো। (সুরা বাক্বারা-১৮৩)

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এই মাসটিতে উপস্থিত হবে সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। (সুরা বাক্বারা-১৮৫)

দান সাদকা করা

রামাদ্বান সহমর্মিতার মাস। গরীব দুঃখীদের এ মাসে বেশি বেশি দান সাদকা দেওয়া দরকার। রাসূল (সা.) এ মাসে বেশি বেশি দান করতেন।

عن ابن عباس قال كان النبى ﷺ أجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমাদ্বানে জিবরাঈল (আ.) যখন তার সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি আরও অধিক দান করতেন। (বুখারী-১৯০২)

অন্য হাদিসে এসেছে-

اى الصدقة افضل؟ قال رسول الله ﷺ صدقة رمضان

রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কখন সাদাকাহ করা উত্তম? রাসূল (সা.) বলেন, রামাদ্বান মাসের সাদাকাহ।

মিথ্যা পরিহার করা

রামাদ্বান মাস ও রোজার বরকত হাসিল করতে হলে যাবতীয় মিথ্যা পরিহার করতে হবে।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.)বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী-১৯০৩)

সহনশীল হওয়া

রামাদ্বান মাসে আমাদেরকে সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে। অন্য কেউ ঝগড়া বা অশ্লীল কথা বললেও সুন্দরভাবে সেটি এড়িয়ে চলতে হবে।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ وإذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل إني إمرؤ صائم

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে তাহলে সে যেন বলে আমি একজন রোজাদার। (বুখারী-১৯০৪)

রোজাদারকে ইফতার করানো

রামাদ্বান গরীব মিসকিনদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মাস। তাই এ মাসে গরীব রোজাদারকে ইফতার করানো ধনী মুমিনদের কর্তব্য। এর অনেক ফজিলত রয়েছে।

عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله ﷺ من فطر صائما كان له مثل أجره غير انه لا ينقص من أجر الصائم شيئا

যায়েদ ইবনু খালিদ আল জুহানি (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, কোনো রোজা পালনকারীকে যে লোক ইফতার করায় সে লোকের জন্যও রোজা পালনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে। কিন্তু এর ফলে রোজা পালনকারীর সওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না। (তিরমিযী-৮০৭)

ইফতারে বিলম্ব না করা

ইফতারের সময় হওয়ার সাথে সাথে বিলম্ব না করে যথাসময়ে ইফতার করা উচিত-

عن سهل ابن سعد ان رسول الله ﷺ قال لا يزال الناس بخير ماعجلوا الفطر

সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, লোকেরা যতদিন সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে। (বুখারী-১৯৫৭)

সাহরি খাওয়া

সাহরি খাওয়া রাসূল (সা.)এর সুন্নাত এবং উম্মতে মুহাম্মদীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

عن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله ﷺ ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب أكلة السحور

আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, আমাদের সাওম ও আহলে কিতাবের সাওমের মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরি খাওয়া (আমরা সাহরি খাই কিন্তু ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা তা খায় না)। (নাসায়ী-২১৬৬)

সাহরির নির্দিষ্ট সময়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে সাহরি খাওয়া রাসূল (সা.)এর সুন্নত।

عن انس ابن مالك، عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبى ﷺ ثم قمنا الى الصلاة- قال قلت كم كان قدر ذلك قال قدر خمسين آية

আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণনা করেন, যায়েদ (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাহরী খাওয়া শেষ করে নামাজ আদায়

করতে দাঁড়ালাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে প্রশ্ন করলাম কি পরিমাণ ব্যবধান ছিল এ দু'টির মাঝে? তিনি বললেন পঞ্চাশ আয়াতের সমপরিমাণ। (তিরমীযি-৭০৩)

ইতিকাফ করা

ইতিকাফ একটি ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। রাসূল (সা.)রামাদ্বান মাসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ইতিকাফ করতেন।

عن عائشة ان النبى ﷺ كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাদ্বানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ (সা.)তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ই'তিকাফ করতেন। (তিরমীযি-৭৯০)

عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রামাদ্বানের শেষ দশ দিন ইবাদাতে এত বেশি সাধনা করতেন যে, অন্য কোন সময়ে এ রকম সাধনা করতেন না। (তিরমিযী-৭৯৬)

ক্বদরের রাত তালাশ করা

লাইলাতুল ক্বদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রামাদ্বানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করতে হবে।

عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)রমজান মাসের শেষ দশ দিন মসজিদে থাকতেন (ই'তিকাফ করতেন), তিনি বলতেন, রমজান মাসের শেষের দশ দিন তোমরা ক্বদরের রাত তালাশ কর। (তিরমিযী-৭৯২)

রাত্রি জাগরণ

রামাদ্বান মাসে রাত জেগে নফল ইবাদত করতে রাসূল (সা.) উৎসাহিত করেছেন।

عن ابى هريرة قال كان رسول الله ﷺ يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাদ্বানের (রাত জেগে) ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতে রাসূল (সা.)উৎসাহিত করতেন, তবে সেটাকে তিনি বাধ্যতামূলকভাবে নির্দেশ দেননি। তিনি বলতেন, ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় যে লোক রমজান মাসে (রাতে ইবাদতে) দণ্ডায়মান হবে সে লোকের পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। (তিরমিযী-৮০৮)

কুরআন তিলাওয়াত

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

রামাদ্বান মাস, যাতে আল-কুরআন নাজিল করা হয়েছে।

প্রতি বছর রামাদ্বানের প্রতিটি রাতে জিবরাইল আ. সেই সময় পর্যন্ত কুরআনের নাজিলকৃত অংশের পুরোটাই রাসূলুল্লাহ (সা.)এর কাছে তিলাওয়াত করতেন ও রাসূল (সা.)এর কাছ থেকে শুনতেন। আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের বছর আল-কুরআন দুইবার তিলাওয়াত করেন। এখান থেকেই ওলামায়ে কেরাম রমাদ্বানে কুরআন খতম তথা সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করা নফল সাব্যস্ত করেন।

وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القران

জিবরাইল আ. রামাদ্বানের প্রতি রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)এর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। (বুখারী)

অতি ভোজন, অতি নিদ্রা, অতি ভ্রমন, অপ্রয়োজনীয় শপিং করা ও সময়ের অপচয় ত্যাগ করা।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, রামাদ্বান মাস অত্যন্ত সম্মানিত মাস। এ মাস সিয়াম সাধনা করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য ফরজ ইবাদত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাসকে এত বেশি সম্মানিত করেছেন যা অন্য কোন মাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এর একমাত্র কারণ হলো আল্লাহ তা'য়ালা এই মাসে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত কুরআনের আলোকে নিজেদের জীবন গঠন করা, নিজেকে কুরআনের রঙ্গে রঙ্গিন করা। কুরআন বাদ দিয়ে, নিজের জীবনকে কুরআনের আলোকে গড়ে তুলতে না পারলে সিয়াম সাধনা হবে মূল্যহীন। যে সমাজে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল-কুরআন অনুপস্থিত, আল-কুরআনের নির্দেশনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। মানব রচিত আইনের ভিড়ে আল কুরআন বড় অসহায়। সে সমাজে পিপাসায় কষ্ট করে সিয়াম সাধনার মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলে মনে হয় না। তাই আসুন এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত আল-কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন করব।

লেখক: সাবেক আহবায়ক, বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্রকল্যাণ পরিষদ।

কুরআন
অধ্যয়নের সোপান

মোসলেহ্ ফারাদী

কুরআন আল্লাহর কালাম (১০:৩৭)। এ কালাম মানবজাতির পথ প্রদর্শক। সন্দেহাতীতভাবে এই কুরআন আল্লাহ সচেতনদের পথ দেখাবে (২:২)। যে কুরআনের পথে চলবে তারই কল্যাণ হবে আর যে এর পথ হারাবে তারই অকল্যাণ হবে (৩৯:৪১) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না (১৩:১) এ কুরআন মানুষের উপদেশের জন্য কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না (২১:১০) কুরআন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসতে (৫৭:৯) মানুষের অন্তরকে নিরাময় দান করতে (১০:৫৭) অসীম জ্ঞানী ও অসীম প্রজ্ঞাময় সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (২৭:৬) কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কুরআন বিমুখ।

নিঃসন্দেহে কুরআনকে যদি পথ চলার জন্য আলো বা বাতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে কুরআন কি বলছে তা বুঝতে হবে। পথ চলায় কুরআন যে নির্দেশ দিচ্ছে, যে সাবধানতা প্রকাশ করছে তা জানতে হবে। পথে কোথায় কি সমস্যা আছে বা কোথায় কি নিরাপদ স্থান আছে তা জেনে নিতে হবে। কুরআন বুঝে না পড়লে তা সম্ভব হবে না। এ বিষয়টি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কুরআনের দুটি শব্দের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। সর্বপ্রথম যখন আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (সা.) এর উপর কুরআন নাজিল করেন তখন 'ইকরা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হচ্ছে 'পড়'। এটাই ছিলো প্রথম শব্দ। কিন্তু এরপর রাসূল (সা.) কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'উতলু' বা 'তেলাওয়াত' কর বলে। পরবর্তী পর্যায়ে কুরআন তেলাওয়াত পরিভাষাটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, তেলাওয়াত অর্থ হচ্ছে বুঝে পড়া এবং তার উপর আমল করা। যা ইকরা শব্দ দিয়ে বুঝা যায় না। প্রথম ইকরা ব্যবহার করা হয়েছে কারণ তখনও তেলাওয়াত করার মত পরিমাণে কুরআন নাজিল হয়নি।

সুরা বাকারার ১২১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন- "যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি এবং যারা তার হক আদায় করে তেলাওয়াত করে তারাই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে" এবং সুরা আল ফোরকানের ৩২ নাম্বার আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, "আল্লাহ তা'য়ালা ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে কুরআন নাজিল করেছেন যেন তা রাসূলের (সা.) অন্তকরণে সুদৃঢ়ভাবে বসে যায়।" এছাড়াও বহু আয়াতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কুরআন বুঝে পড়ার নির্দেশ এসেছে। সুতরাং, প্রতিটি মুমিনের কুরআন অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন এবং কিভাবে অধ্যয়নকে ফলপ্রসু করা যায় তাও জানা দরকার।

কুরআন অধ্যয়নকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে যারা আরবী ভাষায় পারদর্শী নন এবং মাদ্রাসা সিস্টেমে লেখাপড়া করেননি। যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত।

কুরআন ও আমাদের জীবন

সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আগে কুরআন আমাদের কাছে কি চায় তা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি হবে এবং তা বাস্তবায়নের পর্যায় সমূহ কি তাও জানা দরকার।

প্রথম পর্যায়

তেলাওয়াত: প্রথম পর্যায় হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াত। এর মানে সহীহ শুদ্ধভাবে তাজবীদের নিয়মকানুন অনুসরণ করে এবং সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করা।

দ্বিতীয় পর্যায়

বুঝা: যা তেলাওয়াত করছেন, তা যেনো বুঝতে পারেন। কুরআনের বার্তা যেনো মর্মস্পর্শ করে। কুরআন যেনো আপনাকে অনুপ্রাণিত করে। কুরআন না বুঝলে পাঠকের উৎসাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এক রাতে রাসূল (সা.) কুরআনের একটি আয়াত (৫:১১৮) নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত করতে করতে রাত কাটিয়ে দেন। ঐ আয়াতের মর্ম বুঝার কারণে এবং গভীর মনোনিবেশের ফলে এমনটি হয়েছিলো। 'আমাকে ক্ষমা করে দাও' আকুতি নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করলে এমন আবেগ সৃষ্টি হতে পারে। কুরআন বুঝা ব্যতিত তা হওয়া প্রায় অসম্ভব।

তৃতীয় পর্যায়

মুখস্থকরণ: তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে মুখস্থকরণ। মুখস্থ করা যেনো শুধু নামাজে পড়া সুরা সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। মুখস্থ থাকা কুরআন যেকোন সময় তেলাওয়াত করা যায়। যেসব আয়াত আপনাকে অনুপ্রাণিত করে, আপনি যদি সেগুলো সময় সময় তেলাওয়াত করেন গভীর মনোনিবেশ সহকারে তাহলে কুরআন সবসময় আপনার সাথে থেকে আপনাকে পথ দেখাবে।

চতুর্থ পর্যায়

আমল বা বাস্তবায়ন: কুরআনের প্রতিটি নির্দেশমত আপনাকে জীবন চালাতে হবে। আপনি আল্লাহর গোলাম, আর কুরআন আপনাকে বলছে গোলাম হিসেবে কি কাজ করতে হবে। আয়াতে সিজদা তেলাওয়াত করলে আপনি যেভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তেমনি-ভাবে অন্য হুকুমের আয়াত তেলাওয়াত করলেও আপনি সে হুকুম মাথা পেতে নেবেন। আপনি সামনে যাওয়ার হুকুমে এগিয়ে যাবেন, আর পেছনে ফেরার হুকুম পিছপা হবেন। কুরআনের সাথে এটাই আপনার জীবনের সম্পর্ক।

পঞ্চম পর্যায়

প্রচারঃ কুরআনের বাণীকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া। কুরআনকে আপনি কতটুকু ভালোবাসেন তার প্রমাণ হবে কুরআনের বাণী প্রচারে আপনার পেরেশানী কতটুকু তার উপর নির্ভর করে। তা হতে পারে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে, মানুষের মাঝে কুরআনের ভালোবাসা সৃষ্টির প্রচেষ্টার মাধ্যমে, কুরআন বিতরণের মাধ্যমে এবং কুরআনের আলোকে জীবন গড়ার দাওয়াতের মাধ্যমে।

এই প্রবন্ধের লক্ষ্য

উল্লিখিত পাঁচটি পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা, এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। এখানে শুধু দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা হবে। অথবা কুরআন বুঝার ব্যাপারে এখানে আলোচনার চেষ্টা করা হবে। আল্লাহর রেজামন্দী হাসিল করাই এই আলোচনার লক্ষ্য। ইখলাসের সাথে দ্বীন পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই আমাকে হুকুম করা হয়েছে (৩৯:১১)।

তিন পর্যায়ে বুঝা

এখানে তিনটি ধাপে কুরআন বুঝার আলোচনা করা হবে। এই ধাপগুলো এ লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা চিন্তার ফসল। কেউ এর চেয়ে কম বা বেশি স্তরে ও বিন্যাস করতে পারেন। মূলত প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই কর্মপন্থা ঠিক করে নেয়। প্রথম ধাপ হচ্ছে- নিজের জন্য প্রাথমিক পথ নির্দেশনার খোঁজ করা। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে- পুরো কুরআন সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা অর্জন এবং তৃতীয় হচ্ছে-কুরআন সম্পর্কে গভীর অন্তর দৃষ্টি লাভ করা।

প্রথম স্তরের উদ্দেশ্য

প্রথম স্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করা। এ কাজ আল্লাহ তাআলা সকলের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- ''আমি কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি, এই কথা থেকে উপদেশ গ্রহণ করার কি কেউ আছে ? (৫৪:২২)। "আপনি কুরআনের মাধ্যমে সে সমস্ত লোকদেরকে উপদেশ দান করুন যারা আমার হুমকি ও সতর্কতাকে ভয় করে" (৫০:৪৫)। এই কিতাব নিঃসন্দেহে সতর্ক লোকদেরকে পথ দেখাবে (২:২)। প্রথম স্তরের আরও উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজ অন্তরে কুরআনের আবেদন অনুভব করা, নিজের ঈমান মজবুত করা এবং আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও কুরআনের সাথে মহব্বত সৃষ্টি করা। কালামে পাক ঘোষণা করছে- "মুমিনদের সামনে যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে, যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন ঈমান বেড়ে যায় এবং তাদের রবের উপর ভরসা স্থাপন করে" (৮:২)। পছন্দমত অর্থসহ কুরআনের আয়াত মুখস্থ করার মাধ্যমে এ স্তরের বুঝাকে ফলপ্রসূ করা সম্ভব।

দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য

এ স্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো কুরআন সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা নেওয়া এবং কুরআনের বার্তা সম্পর্কে একটি মৌলিক জ্ঞান অর্জন। কিছু নির্বাচিত আয়াত সমূহের অর্থ অনুধাবন করা। একটি তাফসীরগ্রন্থ আদ্যোপান্ত সমাপ্ত করা এবং বুঝে নেওয়া কিভাবে কুরআন আমাদের জীবন ও মানব সমাজকে পরিবর্তন করতে চায়।

তৃতীয় স্তরের উদ্দেশ্য

তৃতীয় স্তরের অধ্যয়নের লক্ষ্য হবে কুরআনের একটি আয়াতকে অন্য আয়াতের সাথে এবং হাদিস ও ইসলামের মূলনীতি সমূহের সাথে মিশিয়ে প্রকৃত অর্থ বুঝে নেয়ার চেষ্টা করা। বিভিন্ন তাফসীরকারকের তাফসীর নীতির সাথে পরিচিত হওয়া এবং তাদের মতামত সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখার যোগ্যতা হাসিল করা। অতঃপর সব মতামতের বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেকোন একটি মতামত গ্রহণ করার মত আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।

প্রথম স্তর অধ্যয়নের পরামর্শ

এ স্তরে অধ্যয়নকারী ব্যক্তি হচ্ছেন, যিনি আরবি শেখার সুযোগ পাননি। যাকে প্রাথমিক শিক্ষার্থী বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তিনি মাত্র শুরু করেছেন। কুরআনের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে।

সময়: সময়ের পরিকল্পনা আসে প্রথম। প্রতিদিন সময় দিতে পারলে ১৫ মিনিট করে বাজেট করা যেতে পারে। যদি দুদিনের প্লান করেন তাহলে এক ঘণ্টা করে আর যদি শুধু একদিন সময় দেন তাহলে দু ঘণ্টা করে সপ্তাহে সময় দেবেন। এভাবে বাজেট করলে বছরে একবার অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত হয়ে যাবে। যারা ধীরগতিকে কুরআন তেলাওয়াত করেন তাদের জন্য এক খতমে ৩০ ঘণ্টার বেশি সময় লাগার কথা নয়।

স্বচ্ছ অনুবাদ: একটি সহজ-সরল অনুবাদের মুসহাফ সংগ্রহ করবেন। যেসব অনুবাদ শব্দে শব্দে করা হয়েছে অথবা বাংলায় করা হয়েছে তা এড়ানোর চেষ্টা করবেন। একথা ও স্বরণ রাখা দরকার যে অর্থের মধ্যেও তরজমাকারীর চিন্তা ধারার প্রতিফলন ঘটে। কাজেই বিশ্বস্ত অনুবাদকের অনুবাদ নিতে হবে।

আরবি ও বাংলা: তেলাওয়াতের বিভিন্ন ধরন অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন- সুললীত কণ্ঠে একটি আয়াত তেলাওয়াত করে তার তরজমা পড়া। অথবা একপাতা কুরআন তেলাওয়াত করে অতঃপর তার তরজমা পড়া। অথবা একটি সুরা তেলাওয়াত করে (যদি ছোট সুরা হয়) অতঃপর তার তরজমা বাংলায় পাঠ করা। আরবি ও বাংলা একই বৈঠকে পড়ার চেষ্টা করা উচিৎ।

প্রয়োজনমত থামুন : ক্রমাগতভাবে উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে তেলাওয়াতের গতি অব্যাহত রাখলে আপনার সামনে এমন আয়াত আসবে যা আপনার হৃদয় কেড়ে নেবে তখন থামুন এবং আয়াতগুলো বারবার তেলাওয়াত করুন। আপনার হৃদয়কে প্রশান্ত করুন। অতঃপর আয়াতটি বা আয়াতসমূহ বা সুরাটি নোট করুন যেনো আবার আপনি ওখানে ফিরে আসতে পারেন এবং হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটাতে পারেন।

মুখস্থ করুন: যে আয়াতগুলো নোট করেছেন সেগুলোকে মুখস্থ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। মুখস্থ করার জন্য অবসর সময়গুলোকে কাজে লাগান। টেকনোলজির এই যুগে মোবাইলে ধারণ করে যেকোন সময় আপনি আয়াত সমূহের কাছে আসতে পারেন। মুখস্থ আয়াত সমূহকে সুযোগমত তেলাওয়াত করুন। বিশেষকরে নামাজে কিরায়াত হিসেবে তেলাওয়াত করুন। হৃদয় ছোয়া আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলে আপনার নামাজে খুশু খুযুও বৃদ্ধি পেতে পারে।

পরিকল্পনা: কুরআন অধ্যয়নের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। কোরআনে রুকু সংখ্যা ৫৪০। প্রতিদিন চার রুকু করে তেলাওয়াত করলে ১৩৫ দিনে আপনি একবার কুরআন খতম দিতে পারেন। অনূর্ধ্ব ছয় মাসের মধ্যে আপনি একবার অর্থসহ কুরআন খতম করতে পারেন। তাফসীরে যাওয়ার আগে একবার পুরো কুরআন অর্থসহ তেলাওয়াত করুন। পুরো কুরআনের উপর আপনার একটা ধারণা হবে এবং বিশেষ আয়াত সমূহের একটি ভাণ্ডার তৈরী হবে।

অন্যের কাছ থেকে শুনুন: অন্যের কাছ থেকে কুরআনের তেলাওয়াত শুনুন। বিশেষ করে যে সমস্ত আয়াতসমূহ আপনার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আজকাল ইন্টারনেটে জগৎ বিখ্যাত ক্বারীদের তেলাওয়াত পাওয়া যায়, তা শুনুন। ইবনে মাসউদ ((রা.)) বর্ণনা করেছেন রাসূল (সা.) তাকে বললেন আমার সামনে কুরআন তেলাওয়াত কর। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.) কুরআন আপনার উপর নাজিল হয়েছে আর আমি আপনাকে তেলাওয়াত করে শুনাব ? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ আমি অন্যদের কাছ থেকে কুরআন শুনতে ভালবাসি। অতঃপর আমি সুরা আন নিসা তেলাওয়াত করতে শুরু করলাম। যখন আমি এ আয়াতে আসলাম- "আর তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে সাক্ষী হাজির করব এবং আপনাকে ঐ সাক্ষীদের উপর সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবো" (৪:৪১) তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, এবার থাম। তখন তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো।

কুরআনের ডাকে সাড়া দিন: উল্লেখিত পদ্ধতিতে কুরআন তেলাওয়াত অব্যাহত রাখুন। আপনার ক্রমাগত উন্নতি হতে থাকবে। মুখস্থ আয়াতসমূহ নামাজে এবং অবসর সময় তেলাওয়াত করতে থাকুন। কুরআন অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ার চেষ্টা করুন। কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকুন। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে হেদায়াতের জন্য দোয়া করতে থাকুন। এরপর দ্বিতীয় স্তরে উঠার চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয় স্তর অধ্যয়নের পরামর্শ

পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, দ্বিতীয় স্তরের কুরআন অধ্যয়নের লক্ষ্য হবে পুরো কুরআন সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা অর্জন এবং কুরআনের সামগ্রিক বার্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া। এই স্তরে কুরআন অধ্যয়নের জন্য নিম্নে কিছু পরামর্শ দেওয়া হলো।

প্রথম স্তরে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তাকে ধরে রাখা হচ্ছে প্রধান কাজ। সুতরাং দ্বিতীয় স্তরের প্রথম স্তরের কাজের উপর ভিত্তি করে করতে হবে। কাজেই প্রথম স্তরের অধিকাংশ কাজই চালু রাখতে হবে এবং দ্বিতীয় স্তরের কাজগুলোকে সুযোগ-সুবিধামত প্রথম স্তরের সাথে যোগ করতে হবে।

প্রথম কাজ হবে একটি ভালো তাফসীর নির্বাচন করা। এমন একটি তাফসীর যা কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং যুগযুগ ধরে তাফসীর শাস্ত্রের যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বর্তমানের সমাধান পেশ করেছে। যেমন তাফহীমুল কুরআন। তাফসীর নির্বাচনের পর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যে আপনি কিভাবে অগ্রসর হবেন। আপনি কুরআনের শুরু থেকে ক্রমান্বয়ে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়নের পরিকল্পনা নিতে পারেন। অথবা প্রথম পর্যায়ে নির্বাচন করা আয়াতগুলোর তাফসীর অধ্যয়ন করতে পারেন। অথবা প্রথম মাক্কী সুরাগুলো এবং পরে মাদানী সুরাগুলো পড়তে পারেন। অথ বা প্রথমে ছোট সুরাগুলো এবং পরে ক্রমান্বয়ে বড় সুরাগুলোর দিকে যেতে পারেন। যে পথেই যান না কেন আপনার মাকসাদ হবে গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি কুরআন খতম করা। কোন একটা সিলেবাস ও আপনি অনুসরণ করতে পারেন। প্রতিদিন এক রুকু করে অধ্যয়নের মাধ্যমে দু'বছরে পুরো কুরআন অধ্যয়নের টার্গেট করতে পারেন।

অধ্যয়নকালে একই ধরনের আয়াতগুলোকে মিলিয়ে দেখুন। এর মানে খাতা-কলম নিয়ে বসুন এবং নোট করুন। চিন্তা করুন শব্দ এবং বাক্যের ধরনের ভিন্নতা কেন হয়। একই ধরনের শব্দ বা আয়াত বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়ে

কী বাণী প্রকাশ করছে তা বুঝার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'য়ালা কী মেসেজ দিতে চাচ্ছেন তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন।

এভাবে অগ্রসর হওয়ার পর আপনি অনুভব পারবেন যে, আরবি ভাষা কিছু জানা হলে আপনার পথযাত্রাটা অনেক সহজ এবং মুগ্ধকর হবে। বারবার ব্যবহৃত শব্দের মূল জানা থাকলে এবং তা থেকে আরও শব্দ গঠনের নিয়ম অবহিত হলে আপনার চলার গতিটা আরো দ্রুত হবে। কাজেই প্রাথমিক পর্যায়ের কুরআন ব্যাকরণ (Grammar) আয়ত্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করুন। ভারতের আলেম শায়খ আব্দুল করীম পারেন যে শব্দগুলো বারবার ব্যবহৃত হয়ে ৮০ভাগ কুরআন জুড়ে আছে, তার মূল শব্দগুলোকে কয়েক পাতায় নিয়ে এসেছেন এবং মৌলিক আরবি গ্রামারের মাধ্যমে শব্দ গঠন রীতি তুলে ধরেছেন। কয়েক পাতার এই কিতাবটির মাধ্যমে ৮০ভাগ কুরআনের শব্দের সাথে একটা ভালো পরিচয় গড়ে উঠে এবং কুরআনের অর্থ জানা সহজ হয়ে যায়। এই পর্যায়ে তাফসীরের সাথে সাথে শব্দে শব্দে তরজমার একটি কুরআন ও সহায়ক হতে পারে। যা শব্দের অর্থ শিখতে এবং একসময় অনুবাদ ছাড়াও অর্থ বুঝতে আপনাকে সাহায্য করবে।

সময় করে এই চলার পথে আপনি কুরআন সম্পর্কে লেখা কিছু সাহিত্য পড়ুন। কুরআনের পটভূমি, কুরআনের মৌলিক বিষয়বস্তু, কুরআনের বাচনভঙ্গী, বিভিন্ন ধরনের তাফসীরের উত্থান, কুরআনের হুকুম সমূহ, কোরআনে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা ইত্যাদি। এসব লেখা কুরআনের গভীরে অবতরণ করতে সাহায্য করবে। প্রতিটি সুরা শুরু করার আগে তার বিষয়বস্তু, পটভূমি পড়ে নিতে হবে। গভীর অধ্যয়নের জন্য আপনি কোন সিলেবাস অনুসরণ করতে পারেন। অথবা কিছু সুরা গভীরভাবে অধ্যয়নের পরিকল্পনা করতে পারেন। এই গভীর অধ্যয়ন অন্যান্য সুরাসমূহ বুঝতে সাহায্য করবে এবং সময় বাঁচাবে।

কুরআন স্টাডি সার্কেলে যোগ দিন। কোথায় আপনার স্তরের কুরআনের আলোচনা হয় তার খোঁজ নিন। তাফসীরকারকদের সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করুন। কুরআন নিয়ে চিন্তা করুন। কুরআনের আবেদন নিয়ে ভাবুন। কুরআন আপনার জীবনকে পরিবর্তন করছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখুন। আপনার কি শুধু জ্ঞানই বাড়ছে না তার সাথে আমলও বাড়ছে, তা ক্ষতিয়ে দেখুন। কুরআন নিয়ে কথা বলুন। তবে নিজের সংকীর্ণ জ্ঞানের কথা ভুলে যাবেন না। নিজের মধ্যে যেন কোন অহংকার সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রাখুন। কুরআনের বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছান। কুরআনকে নিজের সাথী বানান। মনে রাখুন; কিয়ামতে কুরআন আপনার সাথে থাকবে এবং আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ফরিয়াদ করে বলবে- হে আল্লাহ আমি তাকে নিদ্রা যেতে দেইনি সুতরাং আমাকে তার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনকে আপনার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন।

তৃতীয় স্তর অধ্যয়নের পরামর্শ

এই স্তরে আপনি বহু তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে বিচরণ করবেন। আপনি একজন গবেষকের মত কুরআন অধ্যয়ন করবেন। তাফসীরকারকদের দৃষ্টি ভঙ্গি জানার চেষ্টা করবেন এবং কোন মতামত আপনি গ্রহণ

করবেন সে সিদ্ধান্ত নেবেন। যদিও কোন মতামতকে ভুল বলে আখ্যায়িত করতে পারবেন না।

প্রথম দুপর্যায়ের অনেকগুলো কাজকে আপনার সাথে রাখতে হবে। সে'দুয়ের ভিত্তির উপর এ প্রাসাদ আপনি গড়ে তুলবেন। এ পর্যায়ে তিনটি বিষয়ে আপনি লেখা পড়া করুন।

১. তাফসীর ২. তাফসীর এবং কুরআন সম্পর্কে লেখা যেমন-উসুলে তাফসীর এবং ৩. কুরআনিক গ্রামার এবং শব্দ ভাণ্ডার (Vocabulary)

কমপক্ষে তিন ধরনের তিনটি তাফসীর সামনে রাখুন। তাফসীর সমূহকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে যেমন- তাফসীর বির রিওয়ায়াহ (হাদীসের ভিত্তিতে তাফসীর) তাফসীর বির রায়ই (মেধাভিত্তিক তাফসীর) তাফসীর বিল ইশারাহ (ইঙ্গিতের ভিত্তিতে তাফসীর), যুক্তিভিত্তিক তাফসীর, ফিকহ ভিত্তিক তাফসীর, বৈজ্ঞানিক তাফসীর ও আধুনিক তাফসীর। আবার কিছু তাফসীর আছে সব তাফসীরের নির্যাস নিয়ে।

বাংলা ভাষায় অনলাইনে এখন অনেক তাফসীর পাওয়া যায়। যেমন- ইবনে কাসীর ও তাফসীরে মাজহারী (দুটোই) তাফসীর বির রিওয়াইয়াহ বলে প্রসিদ্ধ, তাফসীরে জালালাইন (তাফসীল বির রায়ই বলে পরিচিত) এবং সমসাময়িক তাফহীমুল কুরআন ও ফিজিলালিল কুরআন (দুটোই) আদি ও বর্তমানের সমন্বয়ে রচিত বলে পরিচিত। আরো বহু তাফসীর বাংলা ভাষায় সচারচর বাজারে পাওয়া যায়।

কুরআন সম্পর্কে কমপক্ষে একটি উসূলে তাফসীর অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। যেমন- শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর আল ফাউজুল কাবীর ফি উসূল আত-তাফসীর। উসূল তাফসীর থেকে কমপক্ষে

মাক্কী-মাদানী সুরার বৈশিষ্ট্য, মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত, নাসিখ ও মানসুখ, নাজিলের পটভূমি ও ইসরাইলী বর্ণনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন।

কুরআনকে উপস্থাপন করে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কুরআন কি এবং কেন, তা তুলে ধরার জন্য। তাফসীরকারকদের আলোচনা-সমালোচনা করে অনেক গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। হাদীস গ্রন্থ সমূহে কিতাবুত তাফসীর রয়েছে। এসব লেখাপড়া করা উচিৎ। কুরআন বুঝতে হলে রাসূলে আকরাম (সা.) এর জীবনী অধ্যয়ন করতে হবে। কারণ তার জীবনই হচ্ছে কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা। তাছাড়াও মানব অর্জিত জ্ঞানও অবলম্বন করা উচিৎ। মানুষের জীবন নিয়ে অহরহ গবেষণা হচ্ছে। যেহেতু মানুষের জীবনের জন্যই কুরআন সেহেতু জীবনের জ্ঞান কুরআনের মর্ম বুঝতে সহায়ক হবে।

এ পর্যায়ে কুরআনিক আরবী শেখার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। শিক্ষক ছাড়া নিজে নিজে পড়ে শেখার অনলাইন প্রাথমিক থেকে উচ্চ পর্যায়ের কোর্স সচারচর পাওয়া যায়। কুরআনের অভিধান, কুরআনের শব্দ ভাণ্ডারের তালিকা ইত্যাদি সংগ্রহে থাকা প্রয়োজন। এভাবে কুরআন সম্পর্কিত যত রচনা বা গ্রন্থ অধ্যয়ন করা হবে ততই কুরআনের গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে।

সুরা ফাতিহা দিয়ে আপনার এ ভ্রমণ শুরু হওয়া উচিৎ। আপনার নির্বাচিত সবগুলো তাফসীরগ্রন্থ থেকে সুরা ফাতিহার তাফসীর অধ্যয়ন করুন। এছাড়াও অনেকে শুধু সুরা ফাতিহার তাফসীর আলাদাভাবে লিখেছেন। যেমন-ভারতের স্বনামধন্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। এরপর অন্য আর একটি সুরা ধরুন এবং সব তাফসীর থেকে অধ্যয়ন করুন। তাড়াহুড়া না করে অধ্যয়নের গুনগতমানের দিকে লক্ষ্য করুন। খাতা-কলম সাথে রাখুন এবং নোট করুন। ঈমাম মালেকের 'মোয়াত্তা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ((রা.)) সুরা বাকারার উপর আট বছর ব্যয় করেছিলেন। এর উপর পুরো দখল অর্জন করে সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আপনি ইচ্ছা করলে বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়নও করতে পারেন। বাজারে কুরআন ইনডেক্স পাওয়া যায়। কোন একটি বিষয়ের সব আয়াতগুলোর তালিকা সেখানে মিলে। আপনি নির্বাচিত তাফসীর সমূহে একটি একটি করে বিষয়ের সব আয়াতগুলো অধ্যয়ন করুন। এভাবে একটি বিষয়ের কুরআনী ধারণা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। উস্তাদ খুররম মুরাদ (র.) কুরআন অধ্যয়নের একটি সিলেবাস প্রণয়ন করেছেন। সেখান থেকে ও আপনি শুরু করতে পারেন। আপনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে পুরো কুরআনকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা।

অধ্যয়ন থেকে ফায়দা পাওয়ার নিমিত্তে আপনি সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য প্রবন্ধ লিখতে পারেন এবং আপনার শিক্ষাটা অন্যদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। কুরআনের উপর আপনি তাদাববুর ও তাফাক্কুর করতে থাকিবেন। আপনার চিন্তাভাবনার উপর লিখুন। যে কোনো বিষয়ে কোন তাফসীরকারকের তাফসীরটা আপনার পছন্দনীয় এবং কেন তা লিখুন। কোন তাফসীরকারক সবগুলো বিকল্প চিন্তা করে, তা বিবেচনা করুন। চিন্তা করুন কীভাবে আয়াত বা আয়াতসমূহের শিক্ষা বর্তমানের জন্য প্রযোজ্য। কীভাবে বর্তমান সময়ে কুরআন মানুষের জীবনকে সর্বোত্তমভাবে গাইড করতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করুন।

আপনি যদি কোন তাফসীরকারকের তাফসীরে কোনো বিষয়ের সন্তুষ্ট নন তাহলে তা নোট করুন। সামনে অগ্রসর হলে আপনার সম্মুখে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে কোথাও না কোথাও আপনার প্রশ্নের জবাব মিলে যাবে। অভিজ্ঞ তাফসীরকারকদের সহাযোগিতা নিতেও আপনি ভুলবেন না। এতে আপনার দৃষ্টির প্রসারতা বৃদ্ধি পাবে। কুরআনের সাথে যে ভ্রমণ এটা চিরজীবনের। জীবন সাথী কোআনকে প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণে সাথে রাখতে হবে। তেলাওয়াত, মুখস্থকরণ, অধ্যয়ন, আমল ও বিস্তার কুরআনের হক। আল্লাহ তা'য়ালা যেনো এ হক আদায়ের তাওফিক দান করেন। আমিন

কেন্দ্রীয় সভাপতিঃ মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

ফিকহুস সিয়াম
রোজার মাসায়েল

শায়েখ আব্দুল কাইয়ুম

■ ইচ্ছকৃত ভাবে খাওয়া অথবা পান করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। ভুল বশতঃ খেলে বা পান করলে রোজার ক্ষতি হবে না। তবে স্মরণ হলে বা কেউ স্মরণ করিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করে দিতে হবে। এমনকি মুখের ভিতর থাকা খাদ্যও ফেলে দিতে হবে।

■ সহবাস করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে কেউ যদি এমন কাজ করে বসে তাহলে তাকে কাযা এবং কাফফারা উভয়টা আদায় করতে হবে। আর রোজার কাফফারা হচ্ছে একাধোরে দু'মাস (৬০)টি রোজা রাখতে হবে। মাঝখানে কোন বিরতি নেওয়া যাবে না। আর তা সক্ষম না হলে ৬০ (ষাট) জন মিসকিনকে খাবার দিতে হবে।

■ সহবাস ছাড়া অন্য কোন পন্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খায়েশের সাথে বীর্যপাত ঘটালে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। এমনটি ঘটে গেলে কাফ-ফারা আদায় করতে হয় না। তাওবা করতে হবে ও একটি কাজা রোজা আদায় করতে হবে।

■ নাক দিয়ে পানি বা তরল কিছু টেনে নিলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। কারণ নাকের সংযোগ হচ্ছে খাদ্য নালীর সাথে। নাকে ড্রপ নিলে রোজা ভেঙ্গে যায়। তবে তার ন্যাসাল স্প্রে নিলে রোজা ভঙ্গ হবে না।

■ খাদ্যের বিকল্প যে কোন পুষ্টি জাতীয় জিনিস স্যালাইন বা ইনজেকসান আকারে গ্রহণ করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে সাধারণ ঔষধী ইনজেকশন নিলে রোজা ভঙ্গ হয় না।

■ হিজামার মাধ্যমে রক্ত বের করে নিলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়।

■ রক্ত দান করার জন্য শরীর থেকে রক্ত বেশি পরিমান বের করলে হিজামার উপর কিয়াসের ভিত্তিতে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। শরীরে রক্ত ঢুকালে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়।

■ বদ হজম বা ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইচ্ছে করে বমি হওয়ার ব্যবস্থা করলে, সে বমির কারণে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। স্বাভাবিক বমির কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না। তবে খেয়াল রাখতে হবে খাদ্যনালী থেকে মুখের ভিতর আসার পর বমি যেন আবার গিলা না হয়। তা না হলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে যার নিজস্ব উদ্যোগ ছাড়া এমনিতেই বমি বেরিয়ে এসেছে তার রোযা কাজা করতে হবে না। আর যে কৃত্রিমভাবে বমি করার ব্যবস্থা করেছে তার কাজা আদায় করতে হবে। (আবু দাউদ)

■ মহিলাদের হায়েয অথবা নিফাসের স্রাব শুরু হলে এমন কি ইফতার সময়ের পূর্বক্ষণে শুরু হলেও রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

■ খাদ্য নালী দিয়ে খাদ্য ছাড়া যদি কোন অখাদ্যও গ্রহণ করে তাতেও রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

■ সার্বক্ষণিকভাবে মানসিক রোগী বা পাগল হওয়া ব্যক্তির উপর রোজা ফরয নয়।

■ যে ব্যক্তি দিনের কিছু অংশ পাগল থাকে, আবার অনেক সময় সুস্থ থাকে তার রোজা রাখা উচিৎ এবং রোজা রাখলে রোজা আদায় হয়ে যাবে।

■ যে ব্যক্তি পূর্বের দিন বেহুশ অবস্থায় থাকে তার রোজা আদায় হবেনা। হুশ ফেরত আসার পরবর্তী পর্যায়ে তা কাজা করতে হবে।

■ আর যে ব্যক্তি দিনের বেলায় আংশিকভাবে বেহুশ ছিল আবার বাকী অংশে হুশ ফেরত এসেছে এবং কোন কিছু খাওয়া বা পান করেনি, তার রোজা আদায় হয়ে যাবে।

■ বার্ধক্য এবং অসুস্থতার কারণে (যে অসুস্থতা দূর হওয়ার কোন

আশা নেই) তারা রোজা না রেখে ফিদইয়া প্রদান করবে। প্রতিটি রোজার ফিদইয়া হচ্ছে- কোন মিসকিনকে দু'বেলা খাবার প্রদান, অথবা এক ফিৎরা পরিমাণ দান করে দেওয়া।

■ সাময়িকভাবে অসুস্থ হলে (যদি রোজা রাখতে কষ্ট হয়) এবং পরবর্তীতে সুস্থ হওয়ার আশা রয়েছে, তাহলে তারা রোজা না রেখে সুস্থ হওয়ার পরে কাযা আদায় করবেন।

■ গর্ভবতী মহিলার রোজা রাখতে কষ্ট হলে বা সন্তানের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে পরবর্তী পর্যায়ে কাযা আদায় করবেন। তবে কষ্ট না হলে এবং সন্তানের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে রোজা রাখবেন।

■ সন্তানকে বুকের দুগ্ধ খাওয়ানো মা সন্তানের দুধ না পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে তার জন্য রোজা না রেখে পরবর্তী পর্যায়ে কাজা করা জায়েজ আছে।

মুসাফির সফরের হালতে কষ্ট হলে, তার রোজা না রেখে পরে কাযা আদায় করা জায়েজ আছে।

■ হায়েজ এবং নিফাসের স্রাব চলা অবস্থায় রোজা রাখা জায়েজ নেই। পরবর্তী পর্যায়ে তা কাজা আদায় করতে হবে। ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বাহ্নে বন্ধ হয়ে গেলে রোজা রাখতে হবে। গোসল করতে বিলম্ব হলেও তাতে কোন অসুবিধা নেই।

রোযা নষ্ট হয় না যে সব কারণে-

১. গোসল করা
২. পানিতে ডুবে গোসল করলেও
৩. ইনজেকশন দিলে তবে স্যালাইন নিলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।
৪. স্বপ্ন দোষ হলে।
৫. ফরয গোসল আদায় করতে বিলম্ব হলে। অর্থাৎ ফজরের সময় হয়ে গেলেও।
৬. চোখে ড্রপ দিলে।
৭. কানে ড্রপ দিলে।
৮. ডায়াবেটিস রোগীর ইনসুলিন নিলে।
৯. ভুলে খাওয়ার কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না। তবে স্মরণ হওয়া বা কেউ স্মরণ করে দেওয়া মাত্র বন্ধ করে দিতে হবে। এমন কি যে খাবার মুখে রয়েছে তা সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে ফেলে দিতে হবে। এরপর এক ফোটা পানিও পান করা যাবে না। যে তাকে খেতে দেখবে তার দায়িত্ব হয়ে যায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া
১০. এজমা শ্বাসে কষ্টের কারণে ইনহেলার ব্যবহার করলে।
১১. নাকে স্প্রে ব্যবহার করলে
১২. রক্ত (ইষড়ড়ফ ঃবংঃ) পরীক্ষার জন্য রক্ত দিলে
১৩. দাঁত উঠালে অথবা নাক দিয়ে রক্ত বের হলে। অথবা যেকোন ভাবে শরীরে জখম বা কেটে যাওয়ার কারণে রক্ত বের হলে। তার অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে বা শরীর দুর্বল হয়ে গেলে রোজা ভেঙে কাজা আদায় করা যেতে পারে।
১৪. ওজু করার সময় কুলি করা এবং নাকি পানি নেয়ার সময় অনিচ্ছাকৃত ভাবে পানি ভেতরে ঢুকে গেলে রোজা নষ্ট হয় কি হয় না এ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে রোজা নষ্ট হয় না মতটি অধিকতর গ্রহন যোগ্য।
১৫. রান্না করার সময় খাবারের লবন ইত্যাদি চেক করার জন্য মুখে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিলে রোযা নষ্ট হয় না। খেয়াল করতে হবে যেন গলাধকরণ না হয়ে যায়।
১৬. আতর ব্যবহার করা বা সুগন্ধি নেয়া।
১৭. ঢেকুর আসলে রোজা ভঙ্গ হয় না। ভিতর থেকে কিছু বের হয়ে মুখে এস গেলে তা গলাধকরণ না করে ফেলে দিতে হবে।
১৮. মেসওয়াক করলে।
১৯. সাবধানে স্বল্প পরিমাণ টুথপেষ্ট ব্যবহার করে অল্প সময়ে টুথ ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করলে। তার খেয়াল রাখতে হবে যাতে টুথপেষ্ট গলাধকরণ না হয়ে যায়।

লেখক : ইসলামী স্কলার, ইমাম ও খতিব- ইষ্ট লন্ডন মসজিদ।

মাহে রামাদ্বান থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিলের নয় দফা কর্মসূচি

হামিদ হোসাইন আজাদ

আলহামদুলিল্লাহ! বছরের সেরা মহিমান্বিত মেহমান মাহে রামাদ্বান আমাদের একেবারে দারে হাজির। আহলান ওয়া সাহলান মাহে রামাদ্বান। আল্লাহ পাকের মহান এ নিয়ামত মাহে রামাদ্বান তার রহমত, বরকত এবং মাগফেরাতের ভাণ্ডার নিয়ে অপূর্ব ভালোবাসার মালা হাতে আমাদের পানে ছুটে এসেছে। দয়াময় প্রভু আল্লাহ তা'য়ালা এ মহিমান্বিত মাসকে আমাদের জন্য উপহার দিয়েছেন সকল মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস হিসেবে। এ মাসের দিনগুলো সকল বছরের অন্য সকল দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এ মাসের রাতগুলো অন্য সকল রাতগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাত এবং এ মাসের ঘণ্টাগুলো অন্য সকল ঘন্টার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘণ্টা।

এ মাস হচ্ছে মানবতার মুক্তির বিধান কুরআনের মাস। আল্লাহ বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَ ۗ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"রামাদ্বান মাস, এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের জন্য সঠিক পথনির্দেশের সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) মাপকাঠি হিসেবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা সেই মাসটি দেখার জন্য বেঁচে থাকে, তারা যেন রোজা রাখে। (সুরা বাকারা)

কীভাবে এই মহান মাস থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা লাভ করা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে, তার ৯টি টিপস নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. রামাদ্বান মাসে রোজা ফরজ করার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তা ভালভাবে অনুধাবন করুন

রামাদ্বান মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে এর থেকে পূর্ণ ফায়দা হাসিল করতে হলে সবার আগে আমাদেরকে রোজা ফরজ করার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আমাদের কাছ থেকে কী আশা করেন তা পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে হবে এবং আমাদের শরীর ও মনকে তা অর্জনের জন্য যথাযথভাবে তৈরী করতে হবে।

মহান আল্লাহ রোজা ফরজ করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন:

یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"হে ঈমানদাররা! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা খোদাভীরু হও"। (সুরা বাকারা ১৮৩)

অতএব, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রামাদ্বানের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমাদের শরীর ও মনকে তাকওয়া বা আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে সার্বক্ষণিক সতর্কতা অবলম্বনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চান।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) রামাদ্বানের আগে তাঁর খুতবায় ঘোষণা করেছেন:

'এবং তোমরা যদি এ মহিমান্বিত মাস থেকে পূর্ণ ফায়দা হাসিল করতে চাও তাহলে মনে রেখো যে এ মহিমান্বিত মাসটিই হচ্ছে শরীর, আত্মা এবং জীবনের উদ্দেশ্যকে পুষ্ট করার একটি শক্তিশালী সময়। তোমাদের রোজা, ইবাদাত এবং অভ্যাসগুলিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে। রামাদ্বানের জন্য নিজেকে শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা।

২. রামাদ্বানের গুরুত্ব ও উপকারিতা সঠিকভাবে অনুধাবন করুন

মাহে রামাদ্বান ইসলামি ক্যালেন্ডারে (হিজরি) সবচেয়ে মূল্যবান মাস। এ মাসের মর্যাদা এত মহান যে, এ মাসের একটি রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। নিম্নে রামাদ্বান মাসে রোজা রাখার কিছু গুরুত্ব ও উপকারীতা briefly তুলে ধরা হলো।

- পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় রামাদ্বান মাসে। এ মাস কুরআনের মাস হিসেবে পরিচিত ও সম্মানিত।
- এ মাসে রোজা রাখা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে চতুর্থ স্তম্ভ।
- রোজা তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের রাজপথ।
- ফয়সালার রজনী বা ক্ষমতার রজনী (লাইলাতুল কদর) এই মাসেই রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।
- এই পবিত্র মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অতএব, নির্ঝঞ্ঝাট আত্মগঠনের জন্য এ মাস অতীব গুরুত্বের দাবিদার।
- রামাদ্বানের ওমরাহ হজের সমতুল্য।
- রমাদ্বানে বিশেষ করে এই পবিত্র মাসের শেষ ১০ দিনে ইতিকাফ করা অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে।
- রমাদ্বানে রোজাদারদের ইফতার (রোজা ভাঙার জন্য সূর্যাস্তের খাবার) দেওয়া খুবই সওয়াবের কাজ।

রামাদ্বানপূর্ব খোতবায় রাসূল (সঃ) উম্মাহ কে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেনঃ

হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি (রোজাদার) কোনো মুমিনের জন্য ইফতারের ব্যবস্থা করে, আল্লাহ তাকে এমন প্রতিদান দিবেন যেনো সে একজন দাসকে মুক্ত করেছে এবং আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিবেন।" একজন সাহাবী বললেন: কিন্তু আমাদের সকলের তা করার ক্ষমতা নেই, যার উত্তরে নবী (সা.) বললেন: নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখুন যদিও তাতে অর্ধেক খেজুর বা সামান্য পানিও থাকতে পারে। আর কিছু না।

"হে লোকসকল! যে কেউ এই মাসে উত্তম আচার-আচরণ গড়ে তুলবে, সে যেদিন পা পিছলে যাবে সেই দিন সিরাতের (জান্নাতের সেতু) উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। যে ব্যক্তি এই মাসে তার বান্দাদের কাজের চাপ কমিয়ে দেয়, আল্লাহ তার হিসাব সহজ করে দেন এবং যে কেউ এই মাসে অন্যকে কষ্ট দেয় না, আল্লাহ তাকে বিচারের দিন তার গজব থেকে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো এতিমের প্রতি সদয় আচরণ করবে, আল্লাহ সেদিন তার প্রতি সদয় দৃষ্টি দিবেন। যে ব্যক্তি এই মাসে তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, আল্লাহ সেদিন তার প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন, আর যে কেউ এই মাসে তার আত্মীয়দের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে তার রহমত থেকে দূরে রাখবেন।

যে ব্যক্তি এই মাসে ফরজ নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন এবং যে ব্যক্তি এই মাসে তার ফরজ পালন করবে, তার সওয়াব অন্যান্য মাসের তুলনায় সত্তর গুন হবে। যে ব্যক্তি বারবার আমার উপর আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তার নেক আমলের পাল্লা ভারী করে দিবেন এবং গুনাহর পাল্লা হালকা করে দিবেন। যে ব্যক্তি এই মাসে কুরআনের একটি আয়াত (আয়াত) তিলাওয়াত করবে, সে অন্যান্য মাসের পুরো কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব পাবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রমাদ্বানে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করলে আমাদের পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, যদি বড়ো গুনাহ না করা হয়।

রোজা শুধু অধ্যাত্মিক উপকারই বহন করে না বরং এতে অপরিসীম শারীরিক উপকারিতাও রয়েছে।

আমাদের শরীর আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানাত এবং রোজা আমাদের সেই আমানাতের যত্ন নিতে সাহায্য করে! এখানে নিয়মিত **রোজা রাখার কিছু স্বাস্থ্যগত উপকারিতা তুলে ধরা হলোঃ**

- রোজা আমাদের স্থূলতা (obesity) এবং এর ফলে তৈরী দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে।
- রোজা মানুষের inflammation তথা প্রদাহ কমায়।
- এটি মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং নিউ রো-ডিজেনা রেটিভ ডিসঅর্ডার প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে।
- রোজা ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণকে উৎসাহিত করে।
- এটি হার্টের সক্ষমতা বাড়ায়।
- রোজা মানুষের বার্ধক্যকে বিলম্বিত করতে পারে এবং দীর্ঘ জীবনকে উন্নীত করতে পারে।

মাহে রামাদ্বান মূলত: মুক্তির মাস। এ মাসে রোজা রাখার গুরুত্ব ও উপকারিতাগুলোকে ভালভাবে অনুধাবন করে যারা তা থেকে পূর্ণ ফায়দা নেওয়ার লক্ষ্যে কার্যকর পরিকল্পনা নিয়ে রোজা শুরু করতে পারবে তারা মাহে রামাদ্বান শেষ হওয়ার আগেই নিয়ামতে পূর্ণ এক নতুন জীবনের সন্ধান পাবে, ইনশাআল্লাহ।

৩. রামাদ্বানের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আপনি কি অর্জন করতে চান তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করুন।

মাহে রামাদ্বান থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিল করতে হলে রোজা শুরু করার আগেই এ মহিমান্বিত মাস থেকে আমরা কি অর্জন করতে চাই তার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে নিতে হবে।

রাসূল (সা.) রামাদানের পূর্বে এক জুম্মার খোতবায় তার সঙ্গী সাথীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন,

"ব্যক্তিগত মান উন্নয়নের জন্য (তোমরা) একটি সুনির্দিষ্ট টার্গেট সেট কর।"

অতএব, রামাদ্বান শুরু আগেই আত্মপর্যালোচনা করে কোথায় কোথায় আমাদের দুর্বলতা আছে তা নির্ধারণ করে রামাদ্বান শেষ হওয়ার আগেই এ দুর্বলতাগুলো দূর করার টার্গেট ঠিক করে যথাযথ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া দরকার। একইভাবে যে সব point-এ সম্ভাবনা আছে তা unleash করারও টার্গেট ঠিক করে তা অর্জন করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া দরকার।

এই রমাদ্বানে আপনি কতটা কুরআন তেলাওয়াত করবেন, কতটুকু কুরআন মুখস্ত করবেন, কতজনকে খাওয়াবেন বা ইফতার করাবেন এবং কত রাত জাগবেন তাহজ্জুদের জন্য এ ব্যাপারে একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন। বরকতের মাসে আমাদের নেক আমল ও সাদাকাহের প্রতিদান বহুগুন বেড়ে যায় এবং আমাদের গুনাহ মাফ করা হয়। অতএব কত সাদাকা দিবেন তার লক্ষ্যও ঠিক করে নিতে পারেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস অনুসারে:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উদার ছিলেন এবং রমাদ্বানে তিনি আরও বেশি উদার হতেন। (সহিহ্ বুখারী)

৪. যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল রোজা রাখার চেষ্টা করুন।

রামাদ্বান এমন একটি মাস যাতে আল্লাহ আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন (রোজা ও নামাজের জন্য)। এ মহান মাস দ্বারা আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এ মাস সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, এ মাসে আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে আল্লাহর প্রতিদান, এ মাসে মুমিনের ঘুমও ইবাদততুল্য, নেক আমল এ মাসে অনেক গুন বেশি সওয়াবসহ কবুল হয় এবং এ মাস দোয়া কবুলের এক অপূর্ব মাস। এ মহিমান্বিত মাসকে পূর্ণ সফলতার সহিত পালন করার জন্য আগে থেকেই বেশি বেশি নফল রোজা রেখে এর জন্য তৈরী হওয়া দরকার।

অনেকগুলো সহিহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) শাবান মাস আসলেই বেশি বেশি নফল রোজা রাখতেন। শাবানের রোজা রামাদ্বানের রোজা রাখার মতো। সঠিক প্রস্তুতি ছাড়া রামাদ্বানের উপবাসের দিনগুলিতে যে চাপ আসে তা এড়ানোর জন্য তিনি রোজা রাখার অভ্যাস করতেন এবং এটিকে তার অভ্যাস করে তুলতেন, যাতে তিনি শক্তি ও প্রাণশক্তি নিয়ে রমাদ্বানে প্রবেশ করতে পারেন। অতএব, আমরাও যদি সত্যিকারের হক আদায় করে রোজা পালন করতে চাই তাহলে আমাদেরও রাসূল (সা.)-এর সেই সুন্নাহ অনুসরণ করা দরকার।

আমরা সফল রোজা শুরু করতে পারি, হয় সোম ও বৃহস্পতিবার বা আইয়্যামুল বিজে প্রতি মাসের ১৩তম, ১৪তম এবং ১৫তম দিন বা মাসের যেকোনো তিন দিন। রাসূল (স.) বলেন-

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

আমলগুলি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার (আল্লাহর সামনে) পেশ করা হয়, তাই আমি পছন্দ করি যে আমি রোজা রাখা অবস্থায় আমার আমলগুলোকে যেন পেশ করা হয় (সুনানে তিরমিযী)

অন্য একটি হাদিসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন;

৫. যথাসম্ভব বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াতের চেষ্টা করুন এবং কুরআনের সাথে সম্পর্ক গভীর করার চেষ্টা করুন।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, রামাদ্বান হচ্ছে কুরআনের মাস। আল্লাহ বলেন, "রামাদ্বান মাস, এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের জন্য সঠিক পথনির্দেশের সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) মাপকাঠি হিসেবে।" কুরআনই রামাদ্বান মাসকে এত বরকতময় করেছে। এ মাসে যিনি যত বেশি কুরআনের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে পারবেন তিনি তত বেশি সফল হবেন।

অতএব, আল্লাহর নৈকট্য পেতে এবং আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে বুঝার জন্য এখনই কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করা শুরু করা দরকার। আপনি যতবারই কুরআন পড়বেন দুনিয়া ও আখিরাতে উপকার পাবেন।

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন:- "নিশ্চয় যে ব্যক্তি সুন্দর, মসৃণ এবং সুনির্দিষ্টভাবে কুরআন তেলাওয়ত করবে, সে মহৎ ও আনুগত্যকারী ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। যে ব্যক্তি কষ্ট সহকারে তিলাওয়াত করে বা এর আয়তে হোঁচট খেয়ে পড়ে, তার জন্য তার দ্বিগুন সওয়াব রয়েছে।" (মুসলিম) রামাদ্বান শুরু আগে বেশি বেশি তেলাওয়াতের অভ্যাস রামাদানে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ককে মধুর ও বরকতময় করতে সহায়ক হবে, ইনশা-আল্লাহ।

তেলাওয়াতের সাথে রাসূল (সা.) এর রামাদ্বান পূর্ব খোতবার নিম্মোক্ত আহ্বানকে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

"অতএব, আপনি অবশ্যই আপনার রবকে সমস্ত আন্তরিকতার পাপ ও মন্দ থেকে মুক্ত হৃদয়ে ডাকবেন এবং কায়মনোবাক্যে দোয়া করুন যাতে আল্লাহ আপনাকে রোজা রাখতে এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে সহায়তা করেন। প্রকৃতপক্ষে! হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে এই মহান মাসে আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয়।"

৬. দৈনন্দিন রুটিনে কিছু সুন্নাহ অনুশীলন যোগ করুন, বেশি বেশি যিকির করার অভ্যাস করুন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করুন।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) শাবানের শেষ জুম্মার খোতবায় তাঁর উম্মতকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন:-

"আপনারা আপনাদের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করুন এবং নামাজের সময় হাত তুলে দোয়া করুন কারণ এটি সর্বোত্তম সময়, এই সময়ে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখেন। তারা দোয়া করলে আল্লাহ সাড়া দেন, ডাকলে সাড়া দেন, চাওয়া হলে দান করেন এবং দোয়া করলে কবুল করেন।"

আল্লাহ প্রদত্ত মহান সুসংবাদটি মনে রাখবেন:

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, তারাই তাদের মন্দ কাজগুলোকে আল্লাহ নেক কাজে পরিবর্তন করে দেবেন। কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করণাময়।" (সুরা আল ফুরকান ৭০)

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) আরও বলেছেন,

"হে লোকসকল! আপনারা আপনাদের বিবেককে আপনাদের ইচ্ছার দাস বানিয়েছেন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এটিকে মুক্ত করুন। আপনাদের পাপের ভারী বোঝা থেকে আপনাদের পিঠ ভেঙে যেতে পারে, তাই দীর্ঘ বিরতির জন্য নিজেকে আল্লাহর সামনে সেজদাবনত করুন এবং এই বোঝা হালকা করুন। পূর্ণরূপে বুঝুন যে, আল্লাহ তাঁর সম্মান ও মহিমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যারা নামাজ ও সেজদা (সিজদা) করে তারা বিচারের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করবে।"

আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নিম্মোক্ত নির্দেশনা স্মরণ করুন:-

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۝١٩٠ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۝١٩١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۝١٩٢ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۝١٩٣ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۝١٩٤

"নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং দিন-রাত্রির পরিবর্তনে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। 'তারা তারা' যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি উদ্দেশ্য ছাড়াই এই সমস্ত কিছু তৈরি করেননি। আপনার মহিমা! আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমাদের প্রভু! বস্তুত: আপনি যাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবে তারা সম্পূর্ণরূপে লাঞ্ছিত হবে। আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। আমাদের প্রভু! আমরা আহ্বানকারী কে 'সত্য' বিশ্বাসের জন্য ঘোষণা করতে শুনেছি, 'তোমার প্রভুকে একা' বিশ্বাস কর, তাই আমরা ঈমান এনেছি। আমাদের প্রভু! আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন, আমাদের পাপ থেকে মাফ করে দাও, এবং আমাদের প্রত্যেককে পুণ্যবানদের একজন হিসেবে মরতে দিন। আমাদের প্রভু! আপনি আপনার রসূলদের মাধ্যমে আমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদের দান করুন এবং বিচার দিবসে আমাদেরকে লজ্জিত করবেন না - কারণ আপনি কখনই আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। (সুরা আল ইমরান ১৯০-১৯৪)।

রমাদ্বানে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন নিশ্চিত করার জন্য আগে থেকেই সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার দরকার।

৭. Regular দান করার অভ্যাস করুন, কম্যুনিটি গড়ে তোলার কাজে অংশ নিন: রামাদ্বান মাসে complete করার উদ্দেশ্যে একটি ছোট কম্যুনিটি প্রকল্প চিহ্নিত করুন।

রামাদ্বান মাসে যে আমলগুলোকে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে সাদাকা এবং মানব কল্যাণমূলক কাজ অন্যতম।

আল্লাহ বলেন:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

"পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যেই ধার্মিকতা নয়। বরং ধার্মিক তারাই যারা আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে; যারা তাদের লালিত সম্পদ থেকে আত্মীয়স্বজন, এতিম, দরিদ্র, অভাবগ্রস্থ যাত্রী, ভিক্ষুক এবং বন্দীদের মুক্ত করার জন্য দান করেন; যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করে। এবং যারা কষ্ট, প্রতিকূলতা এবং যুদ্ধের উত্তাপের সময় ধৈর্যশীল। তারাই বিশ্বাসে সত্য এবং তারাই আল্লাহকে স্মরণ করে।" (সুরা বাকারা ১৭৭)

রাসূল (সা.)বলেছেন,

আল্লাহ তার বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ তার সাহায্যকারী অন্যের সাহায্যে থাকে। (মুসলিম)

প্রিয় নবী (সা.) রমজান মাসের পূর্বে প্রদত্ত তাঁর খুতবায় বলেছেন:

"রোজা রাখার সময় কিয়মতের দিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কথা স্মরণ করুন। গরীব-দুঃখীকে দান করুন। আপনার বড়োদের সম্মান করুন, আপনার ছোটদের প্রতি সহানুভূতি করুন এবং আপনার আত্মীয় এবং আত্মীয়দের প্রতি সদয় হোন। আপনার জিহ্বাকে অযোগ্য শব্দ থেকে এবং আপনার চোখকে এমন দৃশ্য থেকে রক্ষা করুন যা দেখার যোগ্য নয় (নিষিদ্ধ) এবং আপনার কানকে এমন শব্দ থেকে রক্ষা করুন যা শোনা উচিত নয়। এতিমদের প্রতি সদয় হোন যাতে আপনার সন্তানরা এতিম হয়ে গেলে তাদের সাথেও সদয় আচরণ করা হয়।"

অতএব, আপনার charitable কাজগুলিকে বাড়ানোর জন্য রমজান পর্যন্ত এগিয়ে থাকা সপ্তাহগুলিকে ব্যবহার করুন, তা অভাবী লোকেদের অর্থ প্রদানের আকারে বা আত্মীয় বা প্রতিবেশীকে সাহায্য অথবা কোন Charity এর মাধ্যমে মজলুম ঘরবাড়ি হারা মানুষকে সাহায্য করা সবই হতে পারে। দান করা আপনার সম্পদকে শুদ্ধ করার একটি উপায় এবং দানের অভ্যাস করে আপনি পবিত্রতার মহিমান্বিত অবস্থায় রামাদ্বান মাসে প্রবেশ করতে পারেন। এটি আপনার জীবনে মহান কল্যাণের দরজাও খুলে দেয়, কারণ নবী (সা.) আমাদের বলেছেন, ''আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর, তাহলে তোমাদের জন্যও (আল্লাহর পক্ষ হতে) ব্যয় করা হবে।'' (মুসলিম)

৮.আপন চরিত্র পর্যালাচনা করুন, তাতে কোন ত্রুটি আছে কিনা খুঁজে বের করুন। রামাদ্বান মাসে চরিত্রকে কিভাবে পরিশুদ্ধ করা যায় তার উপর ফোকাস করুন।

রামাদ্বান শুরুর পূর্বেই আত্মসমালোচনা করে দেখুন আপনার চরিত্রের কোন অংশটিতে দুর্বলতা আছে। তা লিপিবদ্ধ করুন এবং রামাদ্বান মাসে একে একে দুর্বলতা দূর করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

ইমাম আল-গাজালি তার "রিভাইভাল অফ রিলিজিয়স সায়েন্সস" নামক বই- উল্লেখ করেছেন যে হৃদয়ের ক্ষতি করে এমন সমস্ত কিছু থেকে একজনকে অবশ্যই সমস্ত অঙ্গসহ রোজা রাখতে শিখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি নগ্নতা দেখা থেকে চোখকে হেফাজত করতে কিছু টেলিভিশন অনুষ্ঠান এড়িয়ে যেতে পারেন, কানকে অশ্লীল ভাষা শোনা থেকে বিরত রাখতে বিশেষ কথোপকথন ছেড়ে দিতে পারেন এবং জিহ্বাকে তর্ক বা গীবত থেকে বাঁচাতে পারেন। অহংকার থাকলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। অভ্যন্তরীণ রোজা রামাদ্বানের উপবাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে একটি এবং এটি প্রায়শই খাদ্য, পানি এবং যৌন সম্পর্ক থেকে শারীরিক রোজার চেয়ে বেশি কঠিন, তাই আপনি যত তাড়াতাড়ি এটি অনুশীলন শুরু করবেন ততই ভাল।

৯. প্রতিদিন আল্লাহর সাথে কিছু মানসম্পন্ন সময় কাটান এবং দোয়া করুন।

মাহে রামাদ্বান আল্লাহর পক্ষে থেকে আমাদের জন্য এক সেরা নেয়ামত। এ নেয়ামতের সৌরভে আমরা তখনই সুরভিত হতে পারব যখন আমরা আল্লাহকে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করতে পারব। তাই নৈকট্য লাভের নিমিত্তে রোজা শুরুর আগ থেকেই প্রতিদিন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময় আল্লাহর একান্ত কাটানোর অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।

ইবনে রজব আল-হাম্বলী কর্তৃক লাতাইফ আল-মাআরিফ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ রামাদ্বান মাসে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য ৬ মাস দোয়া করতেন। তারপর তারা রামাদ্বানের পরে আরও ৬ মাস দোয়া করতেন, যা তে আল্লাহ তাদের রামাদ্বান মাসে পালন করা ইবাদত কবুল করেন। আমরা নিম্মোক্ত দোয়াগুলো পড়তে পারি।

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَ

অর্থ : হে আল্লাহ আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসকে বরকতময় করে দিন এবং আমাদেরকে রমজান মাসে পৌঁছে দিন।

ইবনে রজব আল-হাম্বলী কর্তৃক লতাইফ আল-মাআরিফ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ রমজান মাসে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য ৬ মাস দোয়া করবেন। তারপর তারা রামাদ্বানের পরে আরও ৬ মাস প্রার্থনা করবে, যাতে আল্লাহ তাদের রমজান মাসে পালন করা ইবাদত কবুল করেন। আমরা নিম্মোক্ত দোয়াগুলো পড়তে পারি।

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী রজব ওয়া শাবান ওয়া বালিগনা রামাদ্বান

অর্থ : হে আল্লাহ আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসকে বরকতময় করে দিন এবং আমাদেরকে রমজান মাসে পৌঁছে দিন।

(মুসনাদে ইমাম আহমাদ) এবং

اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي مِنْ رَمَضَانَ، وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي، وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا

আল্লাহুম্মা সাল্লিমনি লি রমজান ওয়া সালিম রামাদ্বান ওয়া তাসাল্লামহু মিন্নি মুতাকাব্বালা

অর্থ : হে আল্লাহ আমাকে রামাদ্বানের জন্য হেফাজত করুন, আমার জন্য রমজানকে হেফাজত করুন এবং আমার জন্য কবুল করুন।

(ইমাম আত-তাবরানি বর্ণনা করেছেন)

সর্বোপরি, রমাদ্বানে তাঁর আশীর্বাদই আমরা কামনা করি। তাই পুরস্কার কাটানোর প্রস্তুতিতে, আসুন আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাই এবং পরম দাতার কাছ থেকে চাই। এই বছর পবিত্র মাসটি পূরণ করার জন্য আল্লাহ আমাদের প্রস্তুতি সহজ করুন এবং আল্লাহ আমাদের সকল আমল কবুল করুন। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ)

এবং দুআঃ

اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي مِنْ رَمَضَانَ، وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي، وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا

আল্লাহুম্মা সাল্লিমনি লি রমজান। ওয়া সালিম রামাদ্বান লি. ওয়া তাসাল্লামহু মিন্নি মুতাকাব্বালা

অর্থ: হে আল্লাহ আমাকে রামাদ্বানের জন্য হেফাজত করুন, আমার জন্য রমজানকে হেফাজত করুন এবং আমার জন্য কবুল করুন।

সর্বোপরি, রমাদ্বানে তাঁর করুণা আমরা কামনা করি। তার করুণাসিক্ত পুরস্কার পাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে, আসুন আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাই এবং পরম দাতার কাছ থেকে চাই।

রাসূল (সা.) বলেছেন! রামাদ্বান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খোলা থাকে। আসুন আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর শিখানো তরিকায় আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে দোয়া করি যেন জান্নাতের দরজাগুলো যখন খোলা থাকে তখন আমাদের জন্য যেনো বন্ধ না হয়; যখন জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ থাকে, তখন আমাদের জন্য যেন ঐগুলো কখনো খুলে না দেয়। শয়তান কে শৃঙ্খলিত করা হয়েছে, আসুন আমাদের রব্বকে ডাকি তিনি যেন শয়তান কে আমাদের উপর কখনো কর্তৃত্ব করতে না দেয়, আমীন।

এই বছর পবিত্র মাসটি সুন্দর ও সার্থকভাবে পালন করার জন্য আল্লাহ আমাদের প্রস্তুতিকে সহজ করুন এবং আমাদের সকল আমল কবুল করুন, আমীন।

লেখক: জেনারেল সেক্রেটারী, মুসলিস কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

দাওয়াতী কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করণ ও অন্যদেরকে মোটিভেট বা উৎসাহিত করার পদ্ধতি

নুরুল মতীন চৌধুরী

দাওয়াতী কাজ কি?

দাওয়াহ শব্দটি আরবী 'দাআ' শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ ডাকা বা আহ্বান করা। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য কোন ব্যক্তিকে ইসলাম তথা ইসলামী জীবন যাপন পরিচালনার দিকে ডাকা বা তাকে উৎসাহিত করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো তার ইবাদাত করা। আর এই ইবাদাত তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন আমরা উম্মতে মুহাম্মদী হিসাবে আমাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে পারব। সুরা আল-ইমরান এর ১০৪ ও ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎ কর্মের দিকে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তারাই হল সফলকাম। আলে ইমরান: ১০৪

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মাহ মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে উত্থিত করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে। আর আহলে কিতাবরা যদি ইমান আনত তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। তাদের মধ্যে কিছুতো রয়েছে ইমানদার আর অধিকাংশই হল ফাসেক। (আলে ইমরান: ১১০)

একজন মুমিন হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হলো, মানবজাতীকে দ্বীনের পথে ডাকা, সত্যের পথের সন্ধান প্রদান করা, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দিকে ডাকা, জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান এবং জাহান্নামে কঠিন শাস্তির কথা তুলে ধরা। আর এই কাজটিই আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং অন্যান্য সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম করে গিয়েছেন। আল্লাহ পাক সুরা আহযাব-৪৫-৪৬ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

হে নবী নিশ্চয় আমি আপনাকে পাঠিয়েছি একজন শাহেদ বা সত্যের স্বাক্ষ্য দাতা, মুবাশশির বা শুভ সংবাদ দাতা, নাজির বা সতর্ককারী হিসাবে। আর তারই অনুমতি সাপেক্ষে আপনি একজন দায়ী ইলাল্লাহ এবং উজ্জল নক্ষত্র।

আমাদের এই দাওয়াত হলো আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামের দিকে,

একমাত্র কালেমার দিকে, তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের দিকে এবং সর্বোপরি জামায়াতবদ্ধ জীবন বা ইসলামী সংগঠনের দিকে।

দাওয়াতী কাজ এর দৃষ্টিভঙ্গি

- এটি হলো অপরকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া
- এটি হলো পরিত্রাণ পাওয়ার বার্তাগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার একমাত্র প্রক্রিয়া
- দাওয়াতী কাজ সকল মানুষের জন্যই
- দাওয়াহ'র এর মাধ্যমে সমাজ ও অন্তরের পরিবর্তন হয়। নতুন করে জাগরণ ঘটে।

দাওয়াতী কাজের বাস্তবতা

- দাওয়াহ'র কাজ করা বাধ্যতামূলক। এটি ঐচ্ছিক বা গৌণ কোনো কাজ নয়

- কেবলই রাস্তায়, স্কুলে বা অন্য কোথাও কিছু লিফলেট বিতরণ করাই দাওয়াতী কাজ নয়
- দাওয়াহ মানে প্রচলিত বাইরে গিয়েও কাজ করা। পরিচিত পরিবেশে কাজ করে স্বস্তি পেলেই দাওয়াতী কাজ সার্থক হয় না।
- জীবন সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসার নামই দাওয়াহ

আর এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই মোটিভেটেড বা অনুপ্রানীত হতে হবে।

Motivation বা অনুপ্রেরণা কি?

Motivation বা অনুপ্রেরণা হচ্ছে মানুষের এক ধরনের আভ্যন্তরিণ পরিবেশ বা মানসিক অবস্থা যা মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে, চিন্তা ও অনুভূতিকে পথনির্দেশনা দেয়, যার ফলে মানুষ নিজ উদ্যোগে প্রতিযোগিতার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে উৎসাহিত হয়।

কোন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হলে হোক তা সাংগঠনিক, ব্যক্তিগত অথবা অন্য যে কোন কাজ Motivation বা অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়।

Motivation বা অনুপ্রেরণা মানুষকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে মূখ্য চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। যা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ সংশ্লিষ্ট কাজ ও আচরণের সূচনা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে । একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের যাবতীয় মোটিভেশন ও উৎসাহের খোরাক আমাদের দ্বীন ইসলাম থেকেই পাই। মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহই আমাদের জীবনের মূল নিয়ন্ত্রক, মূল উৎসাহদাতা।

ইসলামে মোটিভেশন বা অনুপ্রেরণা পাওয়ার উৎসসমূহ

১. কুরআন, হাদীস ও ইসলামি সাহিত্য নিয়মিত অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ইসলামের কাজে মোটিভেশন পেয়ে থাকি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের সুরা আনফাল এর ২নং আয়াতে উল্লেখ করেনঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।

আখেরাত এর আলোচনা আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনের শেষে যে আরেকটি অনন্তহীন জীবন আছে এবং সেখানে আমাদেরকে জবাবদিহি করার অনুভূতি জাগ্রত করে। এই জবাবদিহির অনুভূতি আমাদেরকে দ্বীনের পথে চলতে অনুপ্রানীত করে। -সুরা তাওবাহর ৩৮নং আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ

"হে মুমিনগন, তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন তোমরা মাটিকে জড়িয়ে ধরো। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি নগণ্য। "

উত্তম সোহবা বা ভাল লোকের সাথে বন্ধুত্ব একটি অন্যতম উপাদান, যা আমাদেরকে দ্বীনের পথে মটিভেট করে। আল্লাহ পাক সুরা তাওবার ৭১ নং আয়াতে বলেন:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী এক অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজের নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে; তাদেরকেই আল্লাহ রহম করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ইসলামী আলোচনা ও বিভিন্ন বক্তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যসমূহ আমাদেরকে দ্বীনের পথে চলার জন্য মোটিভেট করে। শত শত লোক একেকজন ইসলামী আলোচকের বক্তব্য শুনে ইসলামের দিকে ধাবিত হয়। ইসলামী চরিত্র ধারণ করে।

মোটিভেশন এর প্রকারভেদ

দাওয়াতে দ্বীনের কাজে মোটিভেশন দুই ধরনের হতে পারেঃ

- স্ব-প্রণোদিত দাওয়াতী কাজ বা নিজ থেকেই দাওয়াতী কাজে উৎসাহ বোধ করা (Self-motivation)
- অন্যদেরকে দাওয়াতী কাজের জন্য উৎসাহিত করা (Motivating others for Dawah)

স্ব-প্রণোদিত বা Self-motivated হয়ে দাওয়াতী কাজ এর জন্য যা প্রয়োজনঃ

- একটি ভিশন বা স্বপ্ন থাকা এবং সে অনুযায়ী লক্ষ্য ধারণ করা
- ভিশনকে সামনে রেখে একটি বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণকরা
- সে অনুযায়ী যথাযথ পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা
- সবসময় ইতিবাচক মনোভাব রাখা
- ছোট ছোট পদক্ষেপ দিয়ে শুরু করা ।

অন্যদেরকে মোটিভেটেড বা উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করার জন্য যা প্রয়োজনঃ

- তাদের সামনে এই কাজের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পেশ করা
- দাওয়াতী কাজের একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা
- ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে একজন প্রকৃত দায়ী হিসাবে অন্যের

কাছে নজির স্থাপন করা
- সবসময় আশাবাদী ও ইতিবাচক হওয়া এবং হতাশায় না ভোগা
- সকলের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা যাতে তারা দাওয়াতী কজে উৎসাহিত ও অনুপ্রানীত থাকে
- সবসময় টিম ওয়ার্ক বা সামষ্টিক ও সমন্বিত কাজে উৎসাহ দেওয়া
- এই মহতী কাজের জন্য সবসময় তাদের প্রশংসা করা এবং মাঝে মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা
- তাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে সবসময় কর্মমুখর রাখা।

দাওয়াতী কাজে কীভাবে সবসময় উদ্দীপ্ত থাকা যায়?

- একনিষ্ঠতা বা ইখলাস
- সঠিক উদ্দেশ্য বা নিয়ত
- আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বা হুব্বান লিল্লাহ
- নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা
- আল্লাহর জিকির করা/আল্লাহকে স্মরণ করা
- ধৈর্য বা সবর থাকা
- আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ।

একজন দায়ী বা দাওয়াত দানকারীর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী:

- দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা
- খাঁটি ঈমান ও অবিচল বিশ্বাস থাকা
- দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী হওয়া
- কাজে ও কথায় মিল থাকা
- তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ বা আল্লাহর উপর ভরসা করা
- নম্রতা, ভদ্রতা ও বলিষ্টতা থাকা
- বিশুদ্ধ নিয়ত এখলাছ থাকা
- ত্যাগ ও কুরবানির নজরানা পেশ করা
- সবর বা ধৈর্য্য অবলম্বন করা

মটিভেশন বা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেওয়ার বিষয়ে আল কুরআন যা বলেছে

- **مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠)**

- যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে, পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেওয়া হবে। (সুরা গাফির: আয়াত ৪০)

- **مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٠٦١**

যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে, একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (সুরা আনআম: আয়াত ১৬০)

উৎসাহিত করার ইতিবাচক প্রভাব: রাসূল (সা.) এর কৌশল

১. পুরস্কার দেওয়ার কৌশল
২. নেতিবাচক আচরণ নিরুৎসাহিত করার কৌশল
৩. প্রশংসা করার কৌশল
৪. সদাচরণকে উৎসাহিত করার কৌশল
৫. আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর কৌশল
৬. নেতিবাচক আচরণ মুকাবেলার কৌশল

১. পুরস্কার দেওয়ার কৌশল

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً». [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ] ، [وَمُسْلِمٌ].

ইব্নু ‘আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হাদীসে কুদ্সী হিসেবে) তাঁর রব থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ্ ভাল-মন্দ লিখে দিয়েছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করল না, আল্লাহ্ তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখবেন। আর সে ভাল কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবেও করল তবে আল্লাহ্ তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ’ গুণ পর্যন্ত এমনকী এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে দেন। আর যে কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে, তবে তার জন্য আল্লাহ্ মাত্র একটা গুনাহ লিখেন। (সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)

২. নেতিবাচক আচরণ নিরুৎসাহিত করার কৌশল

জারহাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূল (সা.)তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার উরুর কিছু অংশ পোশাক থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। রাসূল (সা.)এ দৃশ্য দেখে বললেন, ‘উরুটি ঢেকে রাখো কেননা এটি তোমার আওরার (সতরের) অংশ। (তিরমিজি)

মুহাম্মাদ জাহাশ (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (সা.)মা’মারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন তার উরুটি উম্মুক্ত। তখন তিনি বললেন, হে মা’মার, তোমার উরুটি ঢেকে রাখো। কেননা তা তোমার আওরার অংশ।” (আহমাদ, আল হাকিম)

৩. প্রশংসা করার কৌশল

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.)বলেছেন,

نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ

شَمَّاسٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ

আবুবকর অতি ভালো লোক, 'উমার অতি উত্তম লোক এবং 'উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ্ও অতি চমৎকার লোক। উসাইদ ইবনে হুদাইর, সাবিত বিন কায়েস বিন শামমাসও খুব ভালো লোক। মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং মুআজ ইবনে আমর বিন আল জামুহও খুবই সজ্জন ব্যক্তি। (তিরমিজি)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.)বলেছেন,

أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ.

"আবুবকর জান্নাতী, উমর জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, আল জুবায়ের জান্নাতী, আব্দুর রহমান বিন আওফ জান্নাতী, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাইদ ইবনে জুবায়ের জান্নাতী এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ জান্নাতী।" (তিরমিজি)

৪. সদাচরণ উৎসাহিত করার কৌশল

- আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।
- وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم (رواه مسلم).
- "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারবে। আমি কি তোমাদেরকে একটি পরামর্শ দেবো যাতে তোমাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে? আর তা হলো, তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও।" (মুসলিম)

৫. আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর কৌশল

عن أبي سعيد الْخُدْرِي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ رَضِيَ بالله رَبًّا، وبالإسلام دِيْنًا، وبمحمد رسولًا، وجَبَتْ له الجنة»، فَعَجِبَ لها أبو سعيد، فقال: أَعِدْهَا عَلَيَّ يا رسول الله، فَأَعَادَهَا عليه، ثم قال: «وأُخْرَى يَرْفَعُ الله بها العَبْد مائة دَرَجَة في الجنة، ما بين كل دَرَجَتَيْنِ كما بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سَبِيل الله، الجهاد في سَبِيل الله

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন: যে ব্যক্তি বলে যে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নবী হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।" আবু সাঈদ এ কথাটি শুনে বিমোহিত হলেন। তাই তিনি নবীজি (সা.)কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল। আমাকে আবার কথাগুলো বলুন।' রাসূল (সা.)আবারও বললেন। এরপর তিনি বললেন, "এমন কিছু আমল আছে যার কারণে জান্নাতী বান্দার অবস্থানকে অনেক উপরের স্তরে উন্নীত করেন। আর মনে রাখবে, জান্নাতে এক স্তর থেকে অন্য স্তরের দূরত্ব আকাশ থেকে জমিনের দূরত্বের সমান। আবু সাঈদ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সেই আমলগুলো কী কী? তখন রাসূল (সা.)বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা, ফি সাবিলিল্লাহ।" (মুসলিম)

৬. নেতিবাচক আচরণ মোকাবেলার কৌশল

عن عمر بن أبي سلمة قال: كنتُ غُلاما في حَجْرِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكانتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَة، فقالَ لِي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا غُلامُ، سمِّ اَلله، وكُلْ بِيَمِينِك، وكُلْ ممَّا يَلِيكَ» فما زَالَتْ تِلك طِعْمَتِي بَعْدُ.

উমর ইবনে আবি সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবীজির (সা.) জিম্মায় ছিলাম। তখন আমি ছিলাম ছোট্ট বালক। একদিন নবীজির সাথে খাবার খাচ্ছিলাম। আমার হাত পাত্রের এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। তা দেখে নবীজি আমাকে খাওয়ার আদব শেখালেন এবং বললেন, বিসমিল্লাহ বলে খাবে। সবসময় ডান হাতে খাবে। প্লেটের কাছের অংশ থেকে খাবে। নবীজি আমাকে শেখানোর পর থেকে সারা জীবন আমি ওভাবেই খেয়েছি। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

দাওয়াতী কাজ করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করে

- প্রশংসার অভাব
- প্রশিক্ষণের অভাব
- নেতিবাচক সমালোচনা
- অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে অভাব
- প্রতিকূল পরিবেশ
- দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব
- একজন মানুষের ওপর অনেকগুলো দায়িত্ব অর্পন করা
- ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব
- পরামর্শ করার মানসিকতার অভাব
- মুহাসাবার অভাব

আল্লাহ পাক কীভাবে আমাদেরকে দাওয়াতী কাজে অনুপ্রানীত করছেন:

- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٣٣)

"তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম।" (সুরা আল ফুসসিলাত: আয়াত ৩৩)

- وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ٣٣١

তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরী করা হয়েছে তাকওয়াবানদের জন্য। (সুরা আলে ইমরান: আয়াত ১৩৩)

- وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ

আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনে কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় ঝরনাধারা। তারা সে গুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুতঃ এ সবকিছুর মাঝে সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা। (সুরা তাওবাহ: আয়াত ৭২)

দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে কিছু প্রয়োজনীয় টিপস:

- দাওয়াতী কাজের মূল লক্ষ্যটি বারবার সামনে আনা
- দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত ও বিকশিত করা
- বারবার একই কৌশল অবলম্বনের ধারা থেকে বেরিয়ে আসা
- দাওয়াতী কাজের উপকরণগুলো সমৃদ্ধ করা
- মুসলিম এবং অ-মুসলিম সবার মাঝেই আশাবাদী হওয়ার মতো পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করা
- এই সত্যটি প্রমাণ ও প্রদর্শন করা যে আজকের সময়েও ইসলাম সবার জন্যই ভীষণই প্রাসঙ্গিক

নবীজির (সা.)দাওয়াতী কাজের সাধারণ নীতিমালাগুলো অনুসরণ করুন

- রাসূল (সা.)যা বলেছেন তাই করেছেন।
- রাসূলের (সা.)দৃষ্টিভঙ্গি, কৌশল ও মানসিকতা ছিল একেবারেই মার্জিত ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।
- রাসূল (সা.)সবসময় উম্মতের বোঝা কমানোর বিষয়ে তৎপর ছিলেন।
- অবিশ্বাসীদের প্ররোচনায় নবীজি (সা.)কখনোই তার মিশন বন্ধ করেননি।
- রাসূল (সা.)ইসলাম ও শরীয়াতের বিষয়ে কখনোই আপোষ করেননি। ছাড়ও দেননি।

পরিশেষে বলতে চাই একটি মাছ যেমন পানি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি একজন মুসলিম দাওয়াতী কাজ ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। একজন মুসলমানের চলনে, বলনে এবং সর্বাবস্থায় দাওয়াতী চরিত্র নিয়ে চলতে হবে। 'সুতরাং আসুন, আমরা একে অন্যকে দ্বীনের পথে চলতে সাহায্য করি, নিজেদেরকে দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত করি এবং জামায়াতবদ্ধ হয়ে একসাথে জান্নাতের পথে এগিয়ে চলি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমীন

লেখক: ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারী,
মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

রামাদ্বান আত্মগঠন পরিবার ও সংগঠন উন্নয়ন

মামুন আল আযামী

রামাদ্বান নিজের, পরিবারের ও দ্বীনি সংগঠনের জন্য উন্নয়নের এক মহান সুযোগ। এই সুযোগ কেউ কাজে লাগিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের সীমাহীন উপকার অর্জন করে। অন্যরা অবজ্ঞা ও অবহেলা করে এই সুযোগ সহজেই হারিয়ে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি থেকে বঞ্চিত হয়। এই বিষয়ে ৫টি জরুরী বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা হল।

১. রমাদ্বানে আত্মগঠন

(ক) রামাদ্বান কুরআনের মাস হিসেবে আমরা কুরআনের দ্বারা আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মকাণ্ড সংশোধন করতে পারি। যেহেতু বড় শয়তানগুলো বন্দী থাকে তাই সুযোগ বেশি এবং বাধা কম।

(খ) কুরআন থেকে ৫টি উপায়ে আমরা শিখতে পারি;

- কুরআনের এক আয়াতকে অন্য আয়াত দিয়ে শিখা
- হাদিস দিয়ে কুরআনকে শিখা
- সাহাবাদের থেকে কুরআনি জীবন শিখা
- তাফসীর পড়ে কুরআনের শিক্ষা অর্জন করা
- জীবনের সবদিকে কুরআন অনুসরণের সংগঠনে যোগ দিয়ে বাস্তব শিখা

(গ) রামাদ্বান তাকওয়ার মাস। তাকওয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলকে জীবনের সব সিদ্ধান্তে মান্য করা। তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে করণীয় ও বর্জনীয় কাজ মেনে চলা। ঈমানের আমলী প্রমাণ এভাবেই হয়। তাকওয়ার প্রমাণ হচ্ছে ফরজ-সুন্নত মেনে চলা ও হারাম-মাকরুহ থেকে মুক্ত থাকা।

(ঘ) এ মাসে ১২টি ব্যক্তিগত কাজ করে তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করা।

১.	তারাবি	(রোজার আগের রাতেই শুরু)
২.	তাহজ্জুদ	(সেহরীর কারণে মহা সুযোগ)
৩.	তাসবীহ	(ছোট ছোট কাজ অনুভূতি নিয়ে করা)
৪.	তাদাররু	(কেঁদে কেঁদে দো'য়া করা)
৫.	তাসাহহর	(সেহরী গ্রহণ)
৬.	তিলাওয়াত	(কুরআন তেলাওয়াত)
৭.	তাফসীর	(তাফসীর থেকে কুরআন বুঝা)
৮.	তাফাক্কুর	(কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা)
৯.	তাদাব্বুর	(কুরআন নিয়ে উপলব্ধি করা)
১০.	তাওবাহ	(গুনাহ থেকে ফিরে আসা ও মাফ চাওয়া)
১১.	তাওয়াদু	(অহংকারী থেকে বিনয়ী হওয়া)
১২.	তাতাওউ	(বেশি বেশি নেক কাজ করা)

এগুলো দিয়ে তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করতে থাকা।

(ঙ) মৌলিকভাবে রামাদ্বানের ফায়দার জন্য ভিত্তি হচ্ছে: তাওহীদকে পবিত্র করতে শিরক বুঝা ও এ থেকে মুক্ত হওয়া। সুন্নাহকে পবিত্র করতে বিদয়াত বুঝা ও এ থেকে মুক্ত হওয়া। ইখলাসকে পবিত্র করতে নিফাককে বুঝা ও এ থেকে মুক্ত হওয়া। এই তিনটি ঈমানের ভিত্তিমূল।

২. ভেতরের ৪টি শক্তি ও কর্মকাণ্ড

(ক) আমাদের মধ্যে ৪টি শক্তি রয়েছে যা বুঝা অত্যন্ত জরুরী। তাহলেই আমরা রামাদ্বানের ফায়দা সঠিক অর্জন করতে পারব ইনশাআল্লাহ। এগুলো হচ্ছে;

- রূহ : নৈতিক সত্তা যা ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে।
- নাফস : বস্তু সত্তা যা মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।
- আকল : বুদ্ধি সত্তা যা চিন্তা ও যুক্তির স্থান।
- কল্‌ব : অনুভূতি সত্তা যা ভাল/মন্দ প্রেরণা দেয়।

(খ) রূহ ও নাফস প্রতিনিয়ত লড়াই করে আমার জীবন পরিচালনার ক্ষমতা নেয়ার জন্য। এটা ভাল ও মন্দের দ্বন্দ।

(গ) এই লড়াইয়ের ৩টি অবস্থা কুরআনে বর্ণিত আছে;

- মুতমাইন্নাহ : যখন রূহ চূড়ান্ত বিজয়ী ও নফস পরাজিত।
- আম্মারাহ : যখন নাফস চূড়ান্ত বিজয়ী ও রূহ পরাজিত।
- লাউয়ামাহ : যখন দৈনিক যুদ্ধ চলছে জয়-পরাজয় উঠানামা করছে।

(ঘ) আকল ও কলব বা বুদ্ধি ও জোশ গাড়ীর ষ্টিয়ারিং ও ইঞ্জিনের মত। দুটোর সমন্বয়ে গাড়ি ঠিকমত চলে। একটি না থাকলে গাড়ি চলবে না বা দুর্ঘটনা ঘটবে। ইঞ্জিন চললে ও ষ্টিয়ারিং খারাপ হলে দুর্ঘটনা ঘটবে। আর ষ্টিয়ারিং ঠিক থাকলে কিন্তু ইঞ্জিন অচল হলে সামনে যাওয়া থেমে যাবে।

(ঙ) রূহ ও নাফসের লড়াইয়ে বিজয়ী শক্তি হচ্ছে আমার জীবন গাড়ীর ড্রাইভার। আর রামাদ্বান রূহকে শক্তিশালী করে নাফসকে অনুগত হবার প্রশিক্ষণ দেয়। তাই দেহ বা নাফস খানা, পিনা, বিশ্রাম বা স্বামী-স্ত্রী গোপন সম্পর্ক দিনের বেলা যেভাবে চায় যখন চায় তখন তা অস্বীকার করে নাফসকে আমাদের ঈমানের বা রূহের অনুগত করা হয়। এর দাবী অস্বীকার নয়, আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সা.) এর নিয়ম মতো এই দাবী পূরণ করে রূহের অধীন করা হয়।

৩। ব্যক্তি ও পরিবার উন্নয়নে রামাদ্বান।

(ক) গভীরভাবে কুরআন, হাদিস ও সীরাত অধ্যয়ন করে জ্ঞান, প্রেরণা ও সাওয়াব অর্জন করে ব্যক্তি উন্নয়ন সম্ভব। জ্ঞানার্জন মুমিনের জন্য ফরজ কাজ।

(খ) অন্তর দিয়ে সময়ের শুরুতে বা জামায়াতে নামাজ পড়লে আল্লাহর সাথে মীরাজ হয় ও প্রশান্তি হয়। এভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দিয়ে নেককার হওয়া যায়।

(গ) আল্লাহকে খুশি করার জন্য যাকাত ও সাদাকা দিয়ে গরীবকে সাহায্য করে আত্মগঠন করা সম্ভব। আমাদের সমাজে বিত্তহীন মানুষের বাঁচতে সাহায্য করা মুমিনের কাজ। রমাদ্বানে এগুলোর বহুগুন বেশি সওয়াব পেতে পারি।

(ঘ) পরিবারের সদস্য/সদস্যাদের কুরআন সুন্নাহ শিক্ষা ও উৎসাহের সাথে অনুসরণে প্রেরণা দেওয়া অত্যন্ত উপকারী।

(ঙ) পরিবারকে একটি ইসলামী সংগঠনের উপশাখা হিসেবে পরিচালনা করে মান উন্নয়ন করা যায়।

৪। রামাদ্বান ও দাওয়াহ-তারবিয়্যাহ উন্নয়ন

(ক) এই পবিত্র মাসে দাওয়াতি ও তারবিয়্যাহ কাজ করলে এর ফলতো ভালো হবেই এর উপর সাওয়াব বহুগুণ অর্জন সম্ভব। মানুষের মন বড় শয়তানমুক্ত থাকায় দাওয়াতী কাজে ফল বেশি পাওয়ার আশা আছে।

(খ) এই মাসে যারা সাড়া দেবেন তাদের ইসলামী সংগঠনের সঙ্গী হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। এতে সাদাকা জারীয়া বোনাস হিসেবে অর্জন সম্ভব। তাছাড়া দ্বীনি সংগঠনের মানুষেরা তাদের চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে সংগঠনকে পরামর্শ দিয়েও উন্নতিতে অংশ নিতে পারেন।

(গ) দাওয়াহ-তারবিয়্যাহ কাজের মাধ্যমে নিজের পরিবারের ও সংগঠনের মান উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখতে রামাদ্বানের প্রেরণা কাজে লাগবে। সঠিক উন্নয়ন হলে তা রামাদ্বানের পরও তা সংরক্ষিত থাকবে সবার চরিত্রে। যদি তা না হয় তবে রামাদ্বান থেকে ফায়দা কম বলেই প্রমাণিত হবে।

(ঘ) দাওয়াতী কাজের জন্য উত্তম হচ্ছে মানুষ বাছাই করা যারা যোগ্য ও আন্তরিক। এরূপ মানুষেরা নিজের পরিবারের সমাজের নৈতিক উন্নয়নে ভাল ভূমিকা রাখতে পারে।যত্রতত্র দাওয়াতি কাজ এরূপ ফল দিতে পারে না যা বাছাই করা মানুষদের সাথে নিয়মিত দাওয়াত দিলে হতে পারে।

(ঙ) অমুসলিম সমাজে বাস করে তাদেরকে যদি ইসলামের মহান আলো তাদের কাছে না পৌঁছাই তবে তারা আল্লাহর কাছে আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে। তাছাড়া আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া দায়িত্ব অবহেলার জন্য আমরা দোষী প্রমাণিত হব। এই ব্যপারে একটা ফর্মূলা উপকারী যা তাদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি হিসেবে কাজে লাগবে। তাদের মহাসত্য অনুসন্ধানের জন্য বলতে পারি যেন তাদেন স্রষ্টাকে খোঁজা ও কেন তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে এবং মৃত্যুর পর কি হবে তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে। এটা হচ্ছে Search । এর পর মহাসত্য পেলে তা গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক। এটা হচ্ছে Accept। এরপর গ্রহন করার প্রমাণ হচ্ছে অনুসরণ। এটা হলো Follow । তারপর উন্নয়ন হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করা জরুরী। এটা হলো Evaluate। Search, Accept, Follow এবং Evaluate এর প্রথম অক্ষরগুলো হচ্ছে SAFE বা নিরাপদ। তাহলে নিজের নিরাপত্তার জন্য দরকার SAFE।

৫। রামাদ্বান কর্মসূচী

(ক) জীবনে সবসময় সুষ্ঠু পরিকল্পনা করলে তা অর্জন করা সহজ হয়। রামাদ্বানের ফায়দা পেতে হলেও পরিকল্পনা করা অত্যাবশ্যক। প্রথমে আমাদের আধ্যাত্মিক (Spiritual) ও ব্যবহারিক (practical) প্রস্তুতি নিতে হবে যেন রামাদ্বান কে মহামূল্যবান মেহমান হিসাবে কবুল করতে পারি।

(খ) এজন্য লক্ষ্যমাত্র ঠিক করে তা অর্জনের জন্য সুষ্ঠু কর্মপন্থা ও পদক্ষেপ ঠিক করা জরুরী। ইংরেজীতে বলা হয় SMART লক্ষ্যমাত্রা। এই অক্ষরগুলো প্রতিটি একটি শব্দের জন্য ব্যবহৃত হয়।

Specific (কাজ ও অর্জন বিষয় স্পষ্ট লক্ষ্য, সাধারণ লক্ষ্য নয়)

Measurable (কাজটির কত সংখ্যা অর্জন করব তা নির্ধারণ)

Achieveable (কাজটি আমার করা সম্ভব হবে কিনা দেখা)

Realistic (কাজ করতে পারিপার্শ্বিক বাধা নাই এটা দেখা)

Timetable (সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ হবে না ঠিক করা)

(গ) দিনের ২৪ ঘণ্টায় ১৪৪০ মিনিটকে চার ভাগে ভাগ করে সমতাপূর্ণ ব্যবহার করলে বেশি অর্জন করা সম্ভব। ৪ টি ভাগ হচ্ছে:

১. ব্যক্তিগত (যা অন্য কেউ করতে পারবে না যেমন:- খাওয়া, ঘুম)
২. সামাজিক (যা পরিবার ,আত্মিয়, বন্ধুদের সাথে দ্বায়িত্ব)
৩. পেশাগত (চাকুরি, ব্যবসা ইত্যাদি কামাইয়ের কাজ)
৪. সাংগঠনিক (দ্বীনি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কাজ) ।

এই চারটির মধ্যে সমতা আনা জরুরী।

(ঘ) দৈনিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা ও তদারকী করা অর্জন ও উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিনের ঘাটতি পরের দিন পূরণ করা ও এই পর্য্যালোচনার উদ্দেশ্য। তাহলেই আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হওয়া ও ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাংগঠনিক জীবন উন্নতি হওয়া সম্ভব। অবজ্ঞা ও অবহেলা করলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অসম্ভব এবং দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি অর্জনের সহায়ক হবে।

(ঙ) মানুষ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করতে পারে কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এটা শুধু আল্লাহই দিতে পারে। সে জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে পরিকল্পনা মত কাজ করতে হবে। আল্লাহ বলেন "তোমাদের চেষ্টা-সাধনা ফল নিশ্চিত করতে পারে না যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তবেই অর্জন সম্ভব হবে।" (সুরা তাকভীর)

আসুন আমরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এবারের রামাদ্বান থেকে জীবনকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি অর্জন করি।

লেখক: তারবিয়াত সেক্রেটারী, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন ইসলামিক স্কলার, প্রশিক্ষক ও চিন্তাবিদ।

রামাদ্বান
পরবর্তী করণীয়

মুহাম্মদ আবুল হোসাইন খান

ভূমিকা: বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আস সালাতু ওয়াস সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ। আরবি চান্দ্র বছরের দশম মাস হলো শাওয়াল। এটি হজ্জের মওসুম বা হজ্জ পালনের ৩টি মাসের (শাওয়াল, যুলকায়দা, যুলহিজ্জাহ) প্রথম মাস। এই মাসের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিতর বা রামাদানের ঈদ অনুষ্ঠিত হয়। পয়লা শাওয়াল সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা (গরীব-মিসকীনদেরকে ঈদের খুশীতে শরীক করার জন্য আর্থিক দান) আদায় করা এবং সবাই মিলে জামায়াতে ঈদের নামাজ পড়া ওয়াজিব। আর এ মাসগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে হজ্জ এবং ঈদের; সম্পর্ক রয়েছে সাওম ও কুরবানীর এবং আরও সম্পর্ক রয়েছে সাদাকা ও যাকাতের। তাই এই মাসসমূহ আমল ও ইবাদতের জন্য অত্যন্ত উর্বর ও উপযোগী এবং ছওয়াব হাসিলের মহা মৌসুম। এজন্য রামাদ্বানের অভ্যেসগুলো জারী রাখার কিছু বাস্তব পরামর্শ।

'করোনা মহামারী' এর মধ্যে রামাদ্বান পালন: জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্ব মুসলিমরা সাওম পালন করতে হয়েছে আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী। মুসলিম বিশ্বের উলামাদের সামষ্টিক ফতোয়া ও সকল মুসলিম ও অমুসলিম দেশের সরকারী নির্দেশের কারণে মসজিদ বন্ধ রেখে বাসায় বাসায় জামায়াতে সালাত আদায় করতে হবে। এ সাবধানতামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বাসার মধ্যেই তারাবীহ ও ক্বিয়ামুল্লাইল আদায়, ইফতার পার্টি বন্ধ করে বাসায় ইফতার, খুতবাহ ছাড়া বাসায় ঈদের জামায়াত, বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসা ও চ্যারিটির জন্য ফান্ড কালেকশনসহ আরো সামাজিক ও দ্বীনি কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত পরিসরে করতে বাধ্য করা হয়েছে।

প্রথমত ফরজ হজ্জ: হজ্জ হচ্ছে ইসলামের ৮-১৩ই যিলহজ্জ ৫দিন ব্যাপী একটি বড় আমল। যা সারা বিশ্ব থেকে দাওয়াত প্রাপ্তরা এসে একসাথে তাওয়াফ, সায়ী, আরাফাহ, জামরাত ও কুরবানি ইত্যাদি সহ হজ্জ আদায় করে থাকেন। আল্লাহ প্রদত্ত তালিকা মত প্রথমে যা সাথে নেওয়া যাবে না তার কথা বলেছেন: ১) রাফাস (যৌন কামনা-বাসনা বা তার উপকরণ), ২) ফুসূক্ব (সব ধরনের গুনাহের কাজ), ৩) জিদাল (তর্ক-বিতর্ক বা ঝগড়া-ঝাটি)। আর দ্বিতীয় বলেছেন, যা সাথে নিয়ে যেতে হবে: ১) সকল ভাল কাজ, জাগতিক ও দ্বীনি প্রস্তুতি এবং ৩) তাক্বওয়া। অর্থাৎ রামাদ্বানের সবচেয়ে বড় অর্জন 'তাক্বওয়া'কে সাথে করে নিয়ে যাও। তাছাড়াও ৯ই যিলহজ্জ সারা বিশ্ব মুসলিমের জন্য আরাফার ১ দিনের রোজা রাসূল (সা:) উম্মতের জন্য হাদিয়া হিসেবে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত 'তাক্বওয়া: হজ্জের প্রস্তুতির মাস হিসেবে যারা হজ্জে যাবেন বলে ইরাদা করবেন, তাদের জন্যে খুবই জরুরী হলো যে, তারা সব ধরনের প্রস্তুতি নেবেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি হলো, সমগ্র রমাদ্বানে যে তাক্বওয়া অর্জন করেছেন; তার লালনের জন্য তাক্বয়াকে সম্বল হিসেবে হজ্জে সাথে নিয়ে যেতে আল্লাহ হুকুম করেছেন। অতএব কুরআনের আলোকে তাক্বওয়া উৎপাদনের মোক্ষম সময় হচ্ছে রামাদ্বান এবং হজ্জ উভয়ই; সুতরাং 'তাক্বওয়া' হচ্ছে

মুমিন জীবনে সঠিক ইবাদত আদায় করার মধ্য দিয়ে উপার্জিত একটি মহামূল্যবান রূহানী-গায়েবী শক্তি। যা অন্য কোনভাবে অর্জন সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ কুরবানি এবং ঈদের: তারপর ঈদুল আযহা দিবস ও তৎপরবর্তী আরো ৩দিন আইয়ামে তাশরীক্ব সহ ৪ দিন ব্যাপী খুশীর আরেক আনুষ্ঠানিকতার নাম। তা ছাড়াও ঈদের দিন ছাড়াও এ চারদিন ব্যাপী ব্যাপকহারে তাকবীরে তাশরীক্ব-এর শ্লোগানে পরিবার সহ মুসলিম কমিউনিটিকে মুখরিত করে তোলা।

চতুর্থতঃ ঈদের দিনের বড় একটি ইবাদত হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পশু কুরবানি দেওয়া। এখানেও তাক্বওয়ার বিরল অনুশীলনীর কথা কুরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ

"(কুরবানির পশুগুলোর) এ গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে মোটেও পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া" (সুরা হজ্জ: ৩৭)। রামাদ্বান, হজ্জ এবং কুরবানি সবই তাক্বওয়া তৈরী করার মোক্ষম উৎপাদন কেন্দ্র তাহলে সহজেই এ কথাটি মেনে নিতে হবে যে, তাক্বওয়া' অর্জনই এসব ইবাদতের মুল উদ্দেশ্য।

পঞ্চমতঃ মুসলিম মিল্লাত ঐ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অধিক সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ফরজ যাকাত আদায় করে থাকেন। গরীবদের হক্ব আদায় করা যেমন দায়িত্ব, তেমনি একজন মুসলিমের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরযকে আনজাম দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে রামাদ্বান অথবা ঈদের মাসকে বাছাই করে যাকাত দিয়ে থাকেন। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকবে, সে রোজার উদ্দেশ্য হাসিলে সক্ষম হবে।

১. তাক্বওয়া অর্জনে সচেতনতার সাথে সচেষ্ট থাকা: তাক্বয়ার সাথে সকল ইবাদতেরই সম্পর্ক। একজন মুমিনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাক্বওয়া অর্জন হলো কিনা তা নিশ্চিত করতে চান, তাই তিনি আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত দিয়ে রেখেছেন, যেমন; রামাদ্বানের পর বাড়তি সাওম পালন, ঈদুল ফিতর উদযাপন, ফিতরাহর খাবার বিতরণ, হজ্জ পালন, তাকবীর ও তাহমীদ (আল্লাহর গুন-গান গাওয়া) উচ্চারণ, পশু কুরবানি, ঈদের সালাত, সাদাকাহ সহ অপরাপর সকল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ 'তাক্বওয়া' অর্জন নিশ্চিত করতে চান। তাই আল্লাহ বলেছেন ''যে ব্যক্তি 'তাক্বওয়া' অর্জনে সক্ষম হয়েছে, সে আসলেই সফলকাম। আর যে এ কাজে ব্যর্থ হয়েছে সে আসলেই চরম ব্যর্থ'' (আশ-শামস: ৮-৯)।

২. ঈদের দিনে প্রকাশ্যে তাকবীর ধ্বনির প্রকাশ: ঈদের খুশিতে শরীক করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তি তার সামর্থের আলোকে নতুন জামা-কাপড় খরিদ করে স্ত্রী সহ পরিবারের সবাইকে উপহার দেবে। একই সাথে তিনি তাওহীদের মহিমা গাইতে সারাদিন তাকবীরের প্রচলন করে দিয়েছেন, যাতে গোটা মুসলিম উম্মাহ বিশ্বব্যাপী তাওহীদের শ্লোগানে মুখরিত করে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে। এজন্য ঈদ শেষ হয়ে গেলেও দান-সাদাক্বাহ, তাসবীহ, তাকবীর যেনো শেষ হয়ে না যায়। তাই আল্লাহর মহিমা প্রকাশার্থে সবাইকে তাকবীরের উপর অভ্যস্থ রাখতে ঈদের আরো চারদিন পর্যন্ত প্রতি ফরজ সালাতের পর এটিকে ওয়াজিব হিসেবে আমল করতে বাধ্য করেছেন।

৩. ফিতরাহ আদায় করে ত্যাগী মানসিকতা অর্জন: সওমের মত ফরজ ইবাদত সমাপন করে তার ভুল-ত্রুটি দূরীকরণার্থে ও মিসকীনদের খাবার সরবরাহ করে ঈদের পরম খুশিতে শরীক করতে ফিতরাহ আদায়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে। একমাস সিয়াম সাধনার পর ঈদের দিন সকালে প্রথম নাস্তা হিসেবে খেজুর সহ অন্যান্য মিষ্টান্ন জাতীয় খাবার ও নতুন জামা-কাপড় ক্রয়ে অসমর্থদের শরীক করার উদ্দেশ্যে 'ফিতরাহ' বিতরণের প্রচলন করেছেন বিশ্বনবী (সা.)। যাতে সবাই সমানভাবে না হলেও মোটামুটিভাবে ঈদের খুশী উপভোগ করতে পারে।

৪. রামাদ্বানের আমল কবুল হওয়ার জন্য দুয়া: রামাদ্বানমাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অতীতের সালফে সালেহীনগণ রামাদ্বানের করা আমলগুলো কবুল হওয়ার জন্যে আল্লাহর দরবারে ধর্ণা দিতেন। পরবর্তী ছয়মাস পর্যন্ত আমল কবুলের দুয়া করতে থাকতেন এবং তার পরবর্তী ছয় মাস আগামী রামাদ্বান পাওয়ার জন্য আগ্রহ ভরে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত দিতে থাকতেন। এ জন্য কেউ কেউ রামাদ্বান পাওয়ার উদ্দেশ্যে আবেগাপ্লুত হয়ে দুয়া করতেন এই বলে ''আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী.....'' যদিও এটি হাদীস নয়, বরং দুয়া; দুয়া হিসেবে এটি পড়া যায়।

৫. এই মাসে ছয়টি নফল রোজা রাখা সুন্নত: রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, ''যারা রমাদ্বানে রোজা পালন করবে এবং শাওয়ালে আরও ছয়টি রোজা রাখবে; তারা যেনো পূর্ণ বছরই রোজা পালন করল।'' (মুসলিম: ১১৬৪; আবু দাউদ: ২৪৩৩)। যদিও তা ফরজ ও ওয়াজিব নয় বরং নফল তথা অতিরিক্ত। রমাদানের সিয়াম সাধনার পর শাওয়ালে আরো ৬টি সম্পূরক রোজা ছাড়াও আরো অনেক নফল রোজা রয়েছে যেমন: ক) সপ্তাহের প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার ২টি, খ) ইসলামী মাসের ১৩-১৫ তারিখের আইয়ামূল বিদের ৩টি রোজা, গ) আরফার ১টি, ঘ) আশুরার ২টি, শা'বানে অতিরিক্ত নফল রোজার প্রচলন।

৬. অর্জিত তাক্বওয়া সতেজ রাখতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা: তাক্বওয়া অর্জনের আশায় আমরা পুরো একটি মাস সিয়াম-সাধনা করে থাকি। আর আল্লাহ তায়ালাও রোজা ফরয করে দিয়ে বলেছেন, 'রোজা পালনের মাধ্যমে আশা করা যায় তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হতে পারবে।' এই তাক্বওয়ার সহজ অর্থ হলো- অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখা। অর্থাৎ একজন রোজাদার রামাদ্বান মাসে খাদ্য-পানীয় বর্জনসহ যাবতীয় অন্যায় কাজ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাক্বওয়া হাসিলের চেষ্টা করেন।

৭. স্মার্ট ফোনের অপব্যবহার থেকে সাবধান: মুসলিম মিল্লাতের জন্যে স্মার্ট ফোনগুলো যেনো ঈমানের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। আসলে স্মার্ট ফোনের কোন দোষ নেই, দোষ হলো তার ব্যবহার পদ্ধতির ব্যাপারে। এটি কেবল উম্মতের যুবক-যুবতীদের জন্যেই নয়, এটি যেনো আজ সকল বয়সের মুমিনের ঈমানের জন্যেই এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। অতএব হে মুসলিম মিল্লাতের ভাই-বোনরা! প্লিজ শয়তানের কথা ও পরামর্শ শুনবেন না, নয়তো কিয়ামতে সে আপনার থেকে পালিয়ে বেড়াবে বলে তার জবান-বন্দিটি আপনি কুরআনের সুরা ইবরাহীমের ৬১-৬২ আয়াতদ্বয় একবার পড়ে জেনে নিন। যেহেতু গত মাসে এগুলো পরিহার করেছিলেন, তাহলে এ ভাল অভ্যাসটিকে আল্লাহকে ভয় করে বাকী ১১ মাসও লালন করুন।

৮. জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়: 'নামাজ কায়েম করো, নিঃসন্দেহে নামাজ অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে।' (আনকাবুত-৪৫) রামাদ্বান মাসে মুসলমানদের মাঝে জামায়াতের সাথে নামাজ পড়ার একটা আন্তরিকতা ও প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এই পরিবেশটা রোজা চলে যাবার সাথে সাথে অনেকটা বিলীন হয়ে যায়। অথচ রোজার মাসে নামাজের যে গুরুত্ব বা না পড়লে যে শাস্তি রোজার পরেও ঠিক সেই গুরুত্ব ও একই শাস্তি। যারা এর গুরুত্ব দেয় না তাদের বেলায় ইমাম হাসান বসরী (রা.) বলতেন ''হায়! ঐ জাতির জন্য আফসোস, যারা আল্লাহকে রামাদ্বান ছাড়া অন্য মাসে আর চিনে না'' অর্থাৎ রামাদ্বান গেলে তারা ঝিমিয়ে পড়ে আর পুণরায় রামাদ্বান এলে তারা ইবাদতে সক্রিয় হয়ে উঠে।

৯. কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন জারী রাখা: রামাদ্বান মাসে অধিক সাওয়াব লাভের আশায় আমরা তিলাওয়াত করে খতম দিয়ে থাকি, যদিও তা সারা বছর করি না। অথচ হাদিসে এসেছে, 'সর্বোত্তম আমল হলো সেটি যা নিয়মিত করা হয়।' অর্থাৎ ভালো কাজ একদিন করে পরের দিন ছেড়ে দেওয়া, এটি ভাল কাজ নয় বরং সর্বোত্তম কাজ হলো যা নিয়মিত করা হয়, পরিমাণে কম হলেও। কেননা রসূল (সা.) বলেছেন ''সেটিই সবচেয়ে ভাল কাজ যা তোমরা হামেশা করো পরিমাণে যদিও তা কম হয়'' (বুখারী)। কাজেই কুরআন অধ্যয়ন রামাদ্বান পরবর্তী সময়েও আমাদের করা উচিত। তাছাড়া কুরআন তো এমন এক কিতাব, যা পাঠ করলে একেক হরফে নির্ঘাত দশ নেকী। রমাদ্বানে একেক হরফে দশ নয়, বরং সত্তর সওয়াব থেকে শুরু হবে এবং এতে বিশাল সওয়াব মিলবে। মনে করুন, এক পাতায় যদি ১০০০টি হরফ থাকে, তা পড়তে একজনের সর্বোচ্চ দশ মিনিট সময় লাগলে পারে। সে হিসেবে ১০০০ এ ৭০ কিংবা ৭০০ দিয়ে গুণন করলে মোট ৭,০০০ অথবা ৭০০,০০০ সওয়াব মিলতেছে। হিসেব করতে আমাদের কালকুলেটর ফেল হয়ে যাবে। এত বিশাল সওয়াব আমরা লাভে ধন্য হবো, আলহামদুলিল্লাহ। পাশাপাশি এ কিতাবকে অধ্যয়ন করে বুঝে আমল করার জন্যে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। এটি বুঝার, জানার, হৃদয়ঙ্গম করার এবং মেনে চলার জন্যে এসেছে, আসেনি কেবল তিলাওয়াত করে সওয়াব কামাতে। আল্লাহ খুব ধমকের সুরে সুরা কিতালে বলেছেন, 'এরা কেন এটিকে বুঝতে চেষ্টা করে না, নাকি তাদের কলবের মধ্যে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে'। সুরা আহযাবে বলেছেন, 'অতি বরকতপূর্ণ কিতাব খানা সরাসরি তাদের প্রতি আমরা পাঠিয়েছি, যাতে তারা এর আয়াতগুলো ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়'। তাই বুঝার চেষ্টা করতে হবে সবাইকে।

১০. কিয়ামুল লাইলের অভ্যাস বজায় রাখা: কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে প্রভুর সাথে বান্দার সম্পর্কের সেতু বন্ধন সৃষ্টি হয়; যা বান্দাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কাজেই প্রভুর সান্নিধ্য লাভের জন্য কিয়ামুল লাইলের এ অভ্যাস রামাদ্বানের পরেও সারা বছর অব্যাহত রাখা চাই, যেহেতু নবী (সা.) কেবল রমাদ্বানেই নয় বরং সারা বছরই তাহজ্জুদ পড়তেন রবের সন্তুষ্টির জন্য এবং তিনি বলেছেন ''তাহজ্জুদ হচ্ছে আমার সালেহ বা নেক বান্দাদের একটি বিশেষ অভ্যাস''।

১১. অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা: রামাদ্বান উপলক্ষ্যে রোজাদারগণ সাধ্যমত চেষ্টা করেন নিজেদেরকে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখতে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি রোজা রেখে অনর্থক কথা ও কাজ ছাড়তে পারল না, তার খাদ্য-পানীয় ত্যাগ করে রোজা রাখার মধ্যে আল্লাহর (সওয়াব দানের) কোনো প্রয়োজন নেই।' এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, অনর্থক কথা বলা ও কাজ করা কতই না গর্হিত কাজ। আল্লাহ অনর্থক কাজ এবং কথা থেকে মু'মিন নিজেকে হেফাজতে রাখবে বলে সুন্দর আদব শিখিয়েছেন এই বলে, 'সফল মু'মিন সে, যে নিজেকে বাজে কাজ ও কথা থেকে বিরত রাখে'।

১২. তাসবীহ ও যিকরের অভ্যাস অব্যাহত রাখা: যে ছোট ছোট যিকরগুলো করতে অভ্যস্থ হয়েছিলাম রমাদ্বানে, সেগুলো অব্যাহত রাখা। আর এ যিকরের আমলটি বেশী করে করতে আল্লাহ বার বার হুকুম দিয়েছেন। সালাহ, সাওম, যাকাহ সহ অন্য কোন আমল বেশী করতে হুকুম করেননি। গুনাহের কাজগুলো চিরতরে ত্যাগ করার আলামতই হচ্ছে সাওম কবুল হওয়া।

১৩. সকল নফল ইবাদত জারী রাখা: রামাদ্বান মাসে রোজাদারগণ অধিক সওয়াব লাভের আশায় অধিক নফল ইবাদত করে থাকেন; যা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। যেমন-কুরআন তিলাওয়াত, তাহজ্জুদ, কিয়ামুল লাইল, তাসবিহ্-তাহলিল, দান-সাদাক্বাহ, তাওবা-ইসতেগফার ইত্যাদি। নফল ইবাদত সব সময় ফরজের ঘাটতি পূরণ করে। সারা বছরই আল্লাহর ইবাদত করতে আল্লাহ বলেন 'তুমি তোমার রব্বের ইবাদত করো যতক্ষণ না মৃত্যু এসে হাজির হয়েছে''।

১৪. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সাধনা অব্যাহত রাখা: কেননা গোটা রামাদানে যে কুরআনের অর্থ বুঝা ও আমল করার উপর সাধনা করলাম, তাফসীর শুনলাম, যুদ্ধ-জিহাদের ইতিসহাস ঘাটালাম, নবীর সীরাত পড়লাম; সে কুরআন এ রামাদানেই নাজিল হয়েছে এবং ইসলামের ফয়সালাকারী ঐতিহাসিক 'বদর' যুদ্ধও ঐ মাসেই সংগঠিত হয়েছিল, নবী (সা:) শত শত সাহাবীকে সাথে নিয়ে এ কঠিন গরমের মৌসুমে সাওম পালনরত অবস্থায় জিহাদ করে দ্বীনের বিজয় নিশ্চিত করেছেন।

১৫. কুরআনের আদেশ-নিষেধ মান্য করা: কেবল তিলাওয়াত করলেই

হয় না, যা পড়লেন তা বুঝার চেষ্টাও করতে হবে আল্লাহ বলেছেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে।’ এই নির্দেশের কারণে সারা বিশ্বের সকল মুসলমান একসাথে রোজা পালন করে। ঠিক তেমনি কুরআনে বলা হয়েছে ‘‘সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে ইসলামের রশীকে শক্ত করে ধরো’’, জামায়াতে নামাজের জন্য রুকুকারীদের সাথে মিলেমিশে রুকু করো, ‘সূদকে আল্লাহ হারাম করেছেন আর ব্যবসাকে আল্লাহ করেছেন হালাল’, জেনা-ব্যভিচারকেও তিনি অনুরূপভাবে হারাম করেছেন’- এ সব তো আল্লারই ফরমান। আমরা কি তাহলে আল্লাহর কিছু ফরমান মানব, আর আমাদের মতের উল্টো হয়ে যায় বলে কুরআনের অপরাপর ফরমানগুলো কি মানবোনা? কিছু মানা আর কিছু ছেড়ে দেওয়া ‘পার্ট টাইম’ মুসলমানের আলামত।

১৬. অন্যকে খাওয়ানোর অভ্যাস অব্যাহত রাখা: রামাদ্বান মাসে সাওয়াবের নিয়তে আমরা সাধ্যমত অন্যকে ইফতার ও সাহরী খাওয়াতে চেষ্টা করি। কারণ হাদিসে এসেছে, ইসলামের সুন্দরতম অভ্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, অপরকে খানা খাওয়ানো, আর এটি জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম কারণও। সুতরাং সাওয়াবের আশায় অন্য মাসেও এ সুন্দর অভ্যাসটি আমাদের অব্যাহত রাখা উচিত। সময় সময় গরীব মানুষকে সাথে নিয়ে খাওয়া অথবা দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো। নিজের মাতা-পিতাকে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা, হাদিয়া-তোহফা দেওয়া, তারা মারা গেলে তাঁদের বন্ধু-বান্ধব অথবা চাচা ও মামাদেরকে বিশেষভাবে সম্মান-সমাদর করা ইত্যাদি।

১৭. দান-সাদাকা করার অভ্যাস ধরে রাখা: রামাদ্বান মাসে রোজাদারগণ দরিদ্রদের উপকার সাধন ও তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সাওয়াব লাভ করার জন্য সাধ্যমত সাদাকা করে থাকেন। কারণ একজন নিঃস্ব, অসহায়, ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন মানুষের খাবার দান ও সাহায্য সারা বছরই প্রয়োজন। বিশেষ করে ছাত্রদের একটু অতিরিক্ত খোঁজ-খবর নেওয়া।

২০. সর্বাবস্থায় ছবর ও সংযমী থাকা: রামাদ্বান মাসে রোজাদারগণ কম খায়, কম কথা বলে, কম ঘুমায়। এর ফলে তারা সংযমী থাকে। ফলে রোজাদারগণ ঝগড়া-ফাসাদ, পরনিন্দা-পরচর্চা প্রভৃতি কাজগুলো কম করে থাকে। যার কারণে গুনাহও কম হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা টানা একমাস রোজা দিয়ে ট্রেনিং দিয়েছেন যেনো রোজা পরবর্তী সময়েও আমরা ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মী হিসেবে আরো সংযমী হয়ে থাকতে পারি। কাজেই আসুন সারাটি বছর জুড়ে আমরা রামাদ্বানের শিক্ষাগুলো ধরে রাখি এবং রমাদ্বানে গড়ে উঠা ভাল ভাল অভ্যাসগুলোকে করণীয় হিসেবে রামাদ্বানের পরবর্তী সময়েও অব্যাহত রাখার ভূমিকায় সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন- আমিন!

লেখক: দাওয়া সেক্রেটারী এম. সি. এ.
ইমাম: ইস্ট লন্ডন মসজিদ ।

জাতিসত্তা বিকাশে কুরআন : আমাদের করণীয়

মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম আজাদী

জাতি সত্তার ধারনা :

জাতি, জাতিসত্তা ইত্যাদির আলোচনা সোশিয়-পলিটিক্সের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ যেমন সমাজ বিজ্ঞানের একান্ত অনুষঙ্গ, তেমনই জাতিরাষ্ট্র (Nation-state), বা তা থেকে আরেকটু এগিয়ে বিশ্বনাগরিকত্ব বা (cosmopolitan) সরাসরি রাষ্ট্রনীতি, বিশ্বরাজনীতি, বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (international relations) এর সাথে এখন আলোচনা হয়ে থাকে।

অতি অধুনা সময়ে স্যামুয়েল হান্টিংটনের "ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশানের" তত্ত্ব দিয়ে বিশ শতকের শেষার্ধে রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, পোলারাইজেশান মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ রাজনৈতিক, ভৌগলিক, ভাষা ভিত্তিক ও গোত্র কিংবা বর্ণভিত্তিক জাতি সৃষ্টি বা জাতীয় চেতনা সৃষ্টির বদলে ধর্মীয় জাতিসত্তার উন্মেষের দিকে পথচলতে শুরু করেছে।

ধর্ম ভিত্তিক জাতিসত্তা :

ধর্মকে কেন্দ্র করে জাতিসত্তার উন্মেষের জন্য যারা কাজ করেছে, তাদের রাষ্ট্রীয় শক্তির সাথে যুক্ত হয় বিশ্ববিজয়ের প্রণোদনা। ফলে তাদের শাসন যেমন দীর্ঘ দেখতে পাই, বহিঃশত্রুদের আঘাতে তাদের বিজয়ও ইতিহাস-খ্যাত হয়ে ওঠে। নবম শতকের আলফ্রেড দ্যা গ্রেটকে (৮৪৮-৮৯৯) বলেন, কিংবা ষোড়শ শতকে ডাচ প্রজাতন্ত্রের বাইব্লিক্যাল চেতনায় জাতিসত্তার উন্মেষকে বলেন, এদেরকে আমরা ধর্মের মোড়কে জাতিসত্তার বিকাশে আধুনিক ইউরোপে রোল মডেল হিসেবে দেখি। তাদের ক্রুসেড একটা হিংসাময় উত্থান হলেও সে সময়ের সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মুসলিম উম্মাহর মডেল আমাদের ইতিহাস নতুন করে লেখার সুযোগ করে দেয় ও ইউরোপকে ধর্মভিত্তিক জাতি প্রতিষ্ঠার পথ দেখায়।

আমি বলতে চেয়েছি, বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহর হুকুম ও তাঁর পরিকল্পনা অনেক সময় আমাদের অবোধগম্য হলেও, বর্তমান পৃথিবী আমাদের বলে দিচ্ছে, ধর্ম ভিত্তিক জাতিসত্তার উন্মেষ এখন অমোঘ ও অলঙ্ঘনীয়। যার পেছনে হয়ত আল কুরআন আমাদের সামনের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

জাতিসত্তার কুরআনি রূপ:

জাতিসত্তার উন্মেষ, উদ্ভব, উত্থান ও বিকাশে কুরআন আমাদের এক অভাবিত দর্শনের কাছে আনে, যার উপর ভিত্তি করে কুরআন অনুসারীরা সমস্ত যুগেই গতিপথ রচনা করতে পারে, গভীর আঁধারে তারা আলোকের হাতছানি পেতে পারে, ও মুসলমানদের পতনের পর আবার উঠে দাঁড়ানোর প্রেরণা লাভ করতে পারে।

আমি মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আপনাদের মন-মস্তিষ্কের বিশাল চাতালে কয় মুঠি চাঁদের আলো ছড়িয়ে দিতে চাই, যাতে করে আপনারা ইতিহাসের কয়েকটা মাইলস্টোন দেখে নিতে পারেন। মক্কা ও মদীনায় নবুওয়াত ও খেলাফতের ছত্র ছায়ায় গড়ে ওঠা দুর্দান্ত এক জাতির প্রতি আপনাদের বিস্ময়ের চোখ ফেরাতে পারেন, যেখানে দেখবেন মানুষের একটা জাতি কিভাবে মানুষের আশার আলো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাষ্ট্রের শক্তি হয়ে উঠছে। বিশ্বজয়ের অপ্রতিরোধ্য সৈনিক হয়ে সম্মুখে ধাবমান হচ্ছে। ওরা মানুষের যেমন প্রিয় ছিলো, বিশ্ব সৃষ্টির আশির্বাদ ছিলো, তারা ফেরেশতাদের মত শুচিশুদ্ধ ছিলো, তারকার বিস্ময় ছিলো, দয়াময় তাদের সকলের প্রতি তেমনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

আমি উমাইয়্যার উমার বিন আব্দুল আযীযকে আপনাদের সামনে আনতেও পারি, না ও আনতে পারি। কারণ উমায়্যাহ শাসনের প্রতি আমাদের চোখ ভালোই টাটায়। কিন্তু আব্বাসীয়দের বাগদাদ তো আমাদের কাছে সহনীয়, তার রাস্তা ও অলিগলি আমাদের গর্বের, তার দারুল হিকমাহ আমাদের জ্ঞানের মিনার, তার সেনা-বাহিনী ছিলো বিশ্বের সেরা পরাশক্তি। আমি উসমানীয়দের দিকে আঙুল তুলবো না, কারণ তাদের প্রতি আপনাদের মন অতো ভালো নাও হতে পারে, কিন্তু মুহাম্মাদ বিন ফাতিহের চেহারার ঝলক শুধু এক পলক একটু দেখতে পারেন; মুসলিম জাতিসত্তা

উন্মেষ ও বিকাশে তার অবদান কুরআনের সাথে সুন্দর মিলে যায়। ভারতবর্ষে বাদশাহ আলমগীর শেষ রাতে শুধু কুরআন নিজ হাতে লিখতেন তাই না। তিনি কুরআনের আদলে প্রতিষ্ঠা করেন এমন এক রাজত্ব যারা সাথে মদীনার বহু মিল ছিলো, কুরআনের অনেক কথা ব্যাঙ্গময় হয়ে উঠতো তার রাজত্বের রাজ দরবারে, বিচারালয়ের বিচারপতিদের রায়সমূহে, পুলিশ কিংবা প্রশাসনের প্রত্যাহিক কর্মে, ব্যবসায় কিংবা বাণিজ্যের কন্ট্রাক্টগুলোতে, অথ বা মসজিদের মাদ্রাসায় ও বড় বড় শিক্ষার আলয়গুলোতে।

জাতি সত্তার প্রথম উপাদান 'ব্যক্তি' সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টি ভঙ্গি:

কুরআন কোন তথাকথিত ধর্মগ্রন্থ নয়। এটা মানব জীবন পরিচালনার গাইড। এর প্রথম ও প্রধান বিষয় বস্তু হলো মানুষ, এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো মহান আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক।

মানুষের পজিশান:

কুরআন মানুষের পরিচয় করিয়েছে 'খলিফাহ' বলে। দুই জায়গায় এই শব্দ এসেছে। চার জায়গায় এর বহুবচন 'খালাইফ' উল্লিখিত হয়েছে। তিন জায়গায় রয়েছে এর বহুবচন "খুলাফা"। কিন্তু আল্লাহ বলে দেননি কার খালিফা মানুষ। তবে এটা বুঝা গেছে প্রতিটি মানুষই খলিফা। বুঝা গেছে অন্য কোন সৃষ্টি থেকে মানুষ আলাদা। এদের দায় দায়িত্ব আলাদা। এদের পদ মর্যাদা উচ্চতর। এদের দায়িত্ব নিতে হয় আগের জেনারেশনের, আগের কোন সৃষ্টির। এরা পরের জেনারেশনের মুয়াল্লিম হয়।

এরা তাই আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান নেয়। 'মিন লাদুন্না ইলমা'। এরা জ্ঞান হাসিল করে। কারণ খিলাফতের কাজ করতে যেয়ে এদেরকে তাবৎ সৃষ্টিকে ৩ ভাবে ব্যবহার করতে হয়।

১- পৃথিবীর মাঝে থাকা সমগ্র শক্তির ব্যবহার করতে হয়। আল্লাহ এ জন্য সমস্ত শক্তিকে তার অধীন করে দিয়েছেন।

২- পৃথিবীতে থাকা সকল ক্ষতিকর সৃষ্টি থেকে নিজে বাঁচতে হয় , অন্যকে বাঁচাতে হয়। এই জন্য জিহাদ, কিতাল, হুদুদ, ইত্যাদি তার জন্য বৈধ করা হয়েছে।

৩- পৃথিবীতে থাকা তার চেয়ে উন্নত সৃষ্টির উপরে তার আসন নিতে হয়।

উন্নত আসন পেতে করণীয়:

এই উন্নত আসন নিতে তাকে বলা হয়েছে কয়েকটি কাজ করতেঃ

এক: তাকে জানতে হবে (ওয়া'লামু), পড়তে হবে (ইক্বরা), তাকে গবেষণা করতে হবে (ইয়াতফাক্কারুন, ইয়াতাদাব্বারুন, ইয়াতাফাক্কাহুন ইয়াসতানবিতুন)। তাকে হতে হবে সূক্ষ্মদর্শী (উলুল আলবাব), দূরদর্শী (উলুল আবসার), জ্ঞানী (আলিম), অভিজ্ঞ (খাবীর), প্রজ্ঞাবান (আক্বিল), চিন্তাবিদ (ফাক্বীহ)। এইপথে তাকে শিক্ষকের কাছে যেতে হয় (ইসআল আহলায যিকর), ভালোদের সহবতে থাকতে হয় (ওয়াসবির নাফসাকা মাআল লাযীনা ইয়াদূনা রাব্বাহুম), জ্ঞান হাসিলে ঘর ছেড়ে অন্য দেশে অন্য স্থানে যেতে হয়, (ওয়া লাওলা নাফার মিন কুল্লি ফিরক্বাতিন তাইফাহ লি ইয়াতাফাক্কাহু ফী দ্দীন)।

দুই: নিজকে জানতে হয়, সে খলিফা, সে আবিদ, সে সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে সেরা। তবে এই সেরা হওয়ার জন্য শর্ত আছে। সেগুলো থাকলেই পদ রক্ষা পাবে। নইলে পশুর চেয়েও অধম। (রাদাদনাহুম আসফালা সাফিলীন)

তিন: তার স্রষ্টাকে জানতে হয়।

(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ)

তাঁর যাত, সিফাত, রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, তাঁর পাঠানো রিসালাত, মালাইকাহ, কিতাব, ও আফআল খুঁটে খুঁটে শিখতে হয়। আখিরাতের জ্ঞান, তাক্বদীরের ফায়সালা তাঁর জীবনে কি প্রভাব ফেলে তার সবকিছু জানতে হয়।

চার: তাকে ইবাদাত করতে হয়। এই ইবাদাতকে নানা ভাগে বিভক্ত করেছেন আল্লাহ। শারীরিক, মানসিক, মৌখিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক, চৈন্তিক, নৈতিক নানা ধরণের। আল্লাহ দারুণ দারুণ শব্দে এই ইবাদাত গুলো সম্পাদনের পথ বলে দিয়েছেন। কাউকে দেখানোর জন্য ইবাদাত হয় না, শোনানোর জন্যও করা যায় না, নিজের ইচ্ছা মত না করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শেখানো পথে হতে হয়। করতে যেয়ে মুখলিস-মুখলাস, সাদিক, আউয়াব, তাউয়াব, মুনীব ইত্যাদি হতে হয়।

পাঁচ: তাকে জোড় বানাতে হয়, তাকে পারিবারিক হতে হয়ে, আত্মীয়তার বন্ধনে নিজকে বেঁধে বাইরে বের হতে হয়। নিজের ঘর, আহল, আল, আক্বরিবা, আশীরাহ, প্রতিবেশী, অধীনস্ত ইত্যাদি অনেকের সাথে নিজকে বেঁধে ফেলতে হয়। রক্তের সম্পর্ক, বিয়ের সম্পর্ক, দুধের সম্পর্ক যতদূর সম্পর্ক চলে যায় যাক, সবার সাথে মিশে যেতে হয়।

ছয়: তাকে ইমাম হতে হয় (ওয়াজআলনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা), উলুল আমর (নির্দেশের অধিকারী গাইড) হতে হয়, শিক্ষক হতে হয়

(أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا)

দাঈ হতে হয়। তাকে ইসলাহের কাজ করতে হয়, তাকে অসহায়দের সাহায্য করতে হয়, ইয়াতিম-প্রতিবন্ধী-নারীদের ওয়ালী ও নাসীর হতে হয়।

সাত: তাকে সুলতান নাসীর (সাহায্যকারী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তি) এর মালিক হতে চেষ্টা করতে হয়, তাকে দুনিয়ার তামকীন (মানব জাতির উপর শক্তি ও কন্ট্রোল) অর্জনে ব্যাপৃত হতে হয়। তাকে নিজের অধিনস্তদের জন্য 'মালিক-রাজা', দায়িত্বশীল (মাস-উল), খলিফা বা দায়িত্ববান প্রতিনিধি হতে হয়।

আটঃ তাকে দুনিয়ার সব স্থানের দিকে তাকাতে হয়। ফিতনাহ ফাসাদ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাকে দুনিয়াময় দেখতে হয়।

জাতিসত্তা বিকাশে কাজকারীদের কুরআনে দেওয়া স্তর সমূহঃ

এই গুলো যিনি বা যারা করেন তাদেরকে কুরআনে অনেক সম্মান দেওয়া হয়েছে। সব কাজ হয়ত তাদের জীবনে করতে পারেন, কিন্তু তার পরেও তাদের মর্যাদা মানবেতিহাসে অনেক অনেক উঁচুতে। এদের শ্রেণীগুলো হলো:

- ❖ এমন কিছু মানুষ ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনিত করেছেন
- ❖ এমন কিছু নর ও নারী ছিলেন যারা এই পৃথিবিতে দ্বায়িত্বান ছিলেন ও আল্লাহর বিধান মুতাবিক দুনিয়া চালায়েছেন। তালূত, জুলকারনায়ন, সাবার রাণী বিলক্বীস
- ❖ এমন কিছু নর নারী ছিলেন আল্লাহর পথে থাকতে যেয়ে জীবন কুবানি করেছেন।
- ❖ এমন কিছু মানুষ ছিলেন যারা জীবনভর আল্লাহর পথে থেকেছেন, যদিও একা ছিলেন, বড় একা। তবু দ্বীন থেকে বিচ্যুত হননি।

একটা জাতির মাঝে একজন মানুষের অবস্থানঃ

একজন মানুষকে তার মানুষ সত্তা বিকাশ করতে কুরআন উপরের পর্যায়গুলোতে নিয়ে আসে। এতে করে একজন মানুষ কখনো হচ্ছে:

- ❖ একজন মানুষ
- ❖ একজন স্বামী বা স্ত্রী
- ❖ একজন বাবা বা মা
- ❖ একজন ছেলে বা মেয়ে
- ❖ অন্যের আত্মীয়
- ❖ পরিবারের দ্বায়িত্বশীল
- ❖ সমাজের একজন, হয়ত দ্বায়িত্বশীল
- ❖ রাষ্ট্রের একজন হয়ত রাষ্ট্র প্রধান ও
- ❖ বিশ্বের একজন, হয়ত বিশ্ব পরিচালনায় ও প্রভাব রাখেন

এগুলোই হলো তার খলিফা ও আবদ হওয়ার নিগুঢ় দিক। এইভাবে একজন মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা হচ্ছেন। এবং এইভাবে সে জান্নাতের অধিকারীও হচ্ছেন।

কোনটি উদ্দেশ্য, একজন মানুষ হয়ে থাকা, নাকি জাতি হিসেবে থাকা?

কুরআন উপরে বলা মানুষের এই অবস্থানগুলোকে সহজাত করে দিয়েছেন। ফলে সে কখনোই পাল হারা একা নয়, একাকীত্বে তার থাকা সম্ভব নয়, এমনকি একা থাকলে একাই তাকে জাহান্নামে যাবার অনেক নিশ্চয়তা আছে।

একজন মানুষের এই অবস্থান সৃষ্টি করে আল্লাহ মানব ধারা কিয়ামত পর্যন্ত নিতে অনেকগুলো স্তরে ভাগ করেছেন।

✓ যাওজ বা জোড়া

✓ বানূন বা "আল" ছেলে মেয়ে। (বানূ ইসরাঈল, বানূ আদাম, আল ইবরাহীম, আল ইমরান, আল মুহাম্মাদ (আলাহিমুসসালাত ওয়াসসালাম)

✓ ক্বীলাহ (গোত্র)। শুঊব এর ক্ষুদ্রতর ইউনিট। যেমন কুরায়শ

✓ শুঊব অনেকগুলো গোত্রের (ক্বীলাহ) সমষ্টি। যেমন আদনান হলো শুঊব।

✓ ক্বাওমঃ যেখানে অনেক শুঊব থাকে

✓ উম্মাহঃ যেখানে অনেক ক্বাওম থাকে। এই উম্মাহর ক্ষুদ্রতম ইউনিট হলো

- ▪ তাইফাহঃ একটা উম্মাহ থেকে কিছু বাছায় করা লোক
- ▪ ফিরক্বাহঃ তাইফার বৃহত্তর ইউনিট

মহানবী (সা.) এর হাতে বানানো জাতির স্বরূপঃ

জাতিসত্তার ইউনিটগুলো কুরআন এই ভাবে সাজিয়েছে। আমাদের নবী (সা.) এর মাধ্যমে বানূন, ক্বাবীলাহ, শুঊব ও ক্বাওমকে বলা যায় মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। কুরআনে শুঊব ও ক্বাবাইলকে বলে দেওয়া হয়েছে একে অপরে পরিচিত হবার মাধ্যম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হওয়ার ক্ষেত্র। এখানে বংশ, গোত্র, কৌলিন্য ক্ষীণ হয়ে গেছে। এখানে মর্যদার মাপকাঠি হয়েছে "তাক্বওয়া"। (সুরা হুজুরাত: ১৩) বরং আমাদের নবী (সা.) অত্যন্ত সার্থক ভাবে যে জাতি তৈরি করেছেন, তা 'উম্মাহ' হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে। এইটা ছিলো ইসলামের সার্বজনীনতা, ও বিশ্বনাগরিকতার খুব স্পষ্ট দিক। এই 'উম্মাহকে' ইসলামের সমাজ বিজ্ঞানীগণ আরো বিস্তৃত করেছেন। তাঁরা একে দুইভাগে ভাগ করেছেন:

১- উম্মাতে ইজাবাহ: যারা ইসলামকে মেনে নিয়েছে
২- উম্মাতে দাওয়াহ: যাদের কাছে ইসলামে বাণী পৌঁছে দেওয়া বাকি আছে।

এটা উম্মাতি চেতনার ইতিবাচক দিক হলো এটা সকল মানুষকেই এখানে একতাবদ্ধ করে। এইভাবে বিশ্ব চললে সেটা "আল্লাহর রাজত্ব" হয়। কখনো কখনো আল্লাহর দেওয়া এই উম্মাহ চেতনার বাইরে শয়তান মানুষকে বিপথগামী করতেও পারে। সে ক্ষেত্রে মানুষ মাঝে দুইটা গ্রুপের উদ্ভব হয়, একটার নাম হয় "হিযবুল্লাহ" অপরটি "হিযবুশশায়াত্বান"।

উম্মাহ চেতনাকে প্রমোট করার ক্ষেত্রে কুরআনী পদ্ধতিঃ

এই সমাজবিজ্ঞানী ধারণা আমাদের কে এক বিপ্লবী বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের সন্ধান দেয়, যেখানে কুরআন আমাদেরকে অত্যন্ত সাবলীল ভাবে বিচরণ করতে দেয়। এইজন্য দেখবেন কুরআন আমাদের কয়েকটি ভাবে এই ধারণাকে বদ্ধমূল করিয়েছে:

বিশ্ববীক্ষা নিমিত্তে ঈমানদারদের প্রতিপদে ডাক দেওয়া হয়েছে।

"ইয়া আয়্যুহান্নাস" বলে ইসলামি দাওয়াতের ক্ষেত্র রচনা করা হয়েছে

কুরআনের মৌলিক নীতি মালা যুগ যুগ ধরে চলে আসা নবী আম্বিয়াগণের শিক্ষার নির্যাস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এবং আগের সকল শারীয়াত মানসুখ করে দিয়ে ইসলামকে একমাত্র জীবন বিধানে রূপায়িত করা হয়েছে। সাথে সাথে এই দ্বীনকে পূর্ণতা দিয়ে বলা হয়েছে এর বাইরে যে বিধানই মানা হবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

(وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ)

(সুরা আল ইমরান: ৮৫)

দুনিয়াতে অবস্থানকারী সমগ্র মানুষের দল উপদলগুলোর সাথে একত্রে জীবন যাপনের এমন সব পথও পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে যা অন্য কোন ধর্মে ও ধর্মগ্রন্থে বিরল।

এই জাতিসত্তার উদ্ভব ও বিকাশে কুরআনের দিক নির্দেশনাঃ

ইতি-পূর্বে আমরা আমাদের আলোচনাকে প্রধানত: বিশ্বের বুকে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিক দিকের নানা প্রাঙ্গনে নিয়ে গিয়েছি। এই পর্যায়ে আমরা আলোচনায় আসবো, যে জাতিসত্তাকে ইসলাম আমাদেরকে উপহার দেয় তার উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তারে কুরআন আমাদের কি বলে, এই প্রসঙ্গে।

আইডিয়োলজি বা দর্শন:

কুরআন উম্মাহের বিকাশে প্রথম যে কাজটা করে তা হলো, তাদের সামনে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে, সংক্ষিপ্ত রূপে অথচ স্পষ্ট ভাবে একটা 'নিখুঁত আইডিয়োলজি' দান করে। আর এটাকেই কেন্দ্র করে একটা জাতির উদ্ভব হবে, তাদের বিকাশ হবে এবং সারা বিশ্ব একই সুতোয় গেঁথে ফেলবে। এই আইডিয়োলজি এত সহজ যে বিলালের মত একদম নিরক্ষর কালো দাস যেমন বুঝতে পারে, বোবা দাসীও তা আয়ত্তে আনতে পারে, আবু বকর, উমার, উসমান, আব্দুর রহমান ইবন আওফ, আলীর মত শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয়রাও ধারণ করতে পারে। রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন। এই 'দর্শন' আমাদের কাছে কুরআন নিম্নের কয়েক পদ্ধতিতে তুলে ধরেছেঃ

১. এই 'দর্শন' নবী মুহাম্মাদের (সা.) এর শুধু নয়, এটা আদম থেকে আসা সকল নবী ও রাসূলের বলা, মানা ও প্রচার করা।

২. এই 'দর্শন' এমন নির্ভেজাল যে, এর বাইরের বিষয়গুলোকে চোখ বুজেই বাতিল বলা যায়। এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে হিযবুল্লাহ ও হিযবুশশায়ত্বান।

৩. এই 'দর্শন' এতই পরীক্ষিত যে তা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি সুলায়মান (আ.) ও যুলক্বারনায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে এক সূত্রে গাঁথা গিয়েছিলো সারা বিশ্বকে।

৪. এই 'দর্শন' ক্ষেত্রে কম্প্রোমাইজ করলে যে জাতিসত্তা গড়ে উঠে তা হয় সংশয়বাদি, এবং ক্ষণভঙ্গুর। ঈসা (আ.) এর ইসলামের সাথে সেন্ট পলসের দর্শন এখানে উল্লেখ করা যায়। একটা 'দর্শন' মাত্র কিছু বছরের মধ্যেই অপূর্ণ হয়ে রইলো।

৫. এই 'দর্শন' মৌলিক ভাবে ৩টা দিক আছেঃ
১. বিশ্বাসগত বিষয়
২. ইবাদাতগত বিষয়।
৩. মুআমালাত ও আখলাক্ব সম্পর্কিত বিষয়।

এই জাতির একজন ব্যক্তির দায়িত্ব:

ইনসানে কামিল:

আল কুরআন মানবজাতির প্রতিটি সদস্যকে তার মর্যদা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এতে করে একজন মানুষের মন-মস্তিষ্কে অপরাজিত, সবল, সুশৃঙ্খল ও শ্রেষ্ঠত্বের মালা পাওয়া এক সৃষ্টি হিসেবে প্রোথিত করে। আমাদের নবি (সা.) এর "কামুলা" (বা পূর্ণতাপ্রাপ্তির) তত্ত্ব ও তা থেকে নেওয়া আল্লামা ইকবালের 'খুদী' তত্ত্ব আমাদের সকল সৃষ্টিকে ব্যবহার করতে পারার এক সেরা সৃষ্টির অধিকারী মনে করিয়ে দেয়। আপনি যদি সুরা নামলের সুলায়মানের রাজত্ব পরিচালনা পদ্ধতি পড়েন, সুরা সাবা এর ইয়েমেন সভ্যতার উন্নতি পর্যবেক্ষণ করেন ও যুলক্বারনায়নের দেশ পরিচালনার নীতি মালা ও রাজ্য শাসনের দৃষ্টি দর্শন অধ্যয়ন করেন, তাহলে দেখবেন কুরআন এই চেতনার ফল কীভাবে ফুটে ওঠে তা কত সুন্দর ভাবেই তুলে ধরেছে।

অন্যেও সেবাব্রত:

এই চেতনায় ঋদ্ধ হয়েই আবু বকর (রা) দ্বীন বাঁচানোকে জীবনের সেরা উদ্দেশ্য মনে করেন, বিশ্ব মাজলুমকে বাঁচাতে উমার (রা.) দিকে দিকে জেনারেলদের মার্চ করান, খলিফা ওয়ালিদের (রা.) ঘোড়া ভারত, চীন, আফ্রিকা ও ইউরোপে ছুটে চলে। এই দর্শনকে সাহাবি আমের ইবন রিব'ঈ (রা.) এই ভাবে বলেছেন:

لقد ابتعثنا اللهُ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة

অর্থাৎ আমরা এমন এক জাতি, যাদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন, যাতে করে আমরা মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে আল্লাহর গোলামিতে নিয়ে আসি, ধর্ম সমূহের নিগড় থেকে তাদেরকে ইসলামের ইনসাফে নিয়ে আসি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ততায় নিয়ে আসি।

একতাবদ্ধ হওয়া:

এই আক্বীদাহ বিশ্বাস ও আদশ চেতনাকে আল্লাহ পালন করতে যেয়ে আল কুরআন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে নির্দেশ দিয়েছে। ঐক্যবিহীন জাতিকে ধ্বংসের গহব্বরে পতনোন্মুখ বলে উল্লেখ করেছে। এটা এতোই অপরিহার্য বিষয় যে এই ঐকমত্য না থাকলে জাতির পতন অনিবার্য বলা হয়েছে। তাদের সম্মান চলে যাবে

বলা হয়েছে, তাদের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী বুঝানো হয়েছে। এই ঐকমত্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, হারুন (আ.) ঐক্যের খাতিরে জাতির গো-বাছুর পূজাও সহ্য করেছিলেন এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমাও করেছিলেন। কুরআন পড়লে দেখা যায় দ্বিধা বিভক্তি মানব জাতির উন্মেষ ও বিকাশের চির শত্রু। ইখতিলাফ বা মত পার্থক্যে আল্লাহ সহনশীল। বরং তিনি মাঝে মাঝে বলেছেন বেশ কিছু অমিমাংসিত বিষয় আল্লাহ কিয়ামতে ফায়সালা করে দেবেন। মত পার্থক্য জনিত কারণে মনে একটু শত্রুতা ভাব এলেও, হিংসা দেখা দিলেও আল্লাহ তা জান্নাতে যাবার অন্তরায় করবেন না। বরং জান্নাতে যাবার আগে ওই সব মানবিক দুর্বলতা ধুয়ে দেবেন। কিন্তু 'তাফাররুক' বা বিভক্ত হয়ে যাওয়া তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

জাতি সত্বা বিকাশে শিক্ষা ব্যবস্থা:

আদর্শ ও চেতনাকে বুঝার জন্য কুরআন শিক্ষাকে বাধ্যতা মূলক করেছে। প্রথম আয়াত ই হলো "ইক্বরা"। কুরআনের এই শিক্ষাকে কোন গণ্ডীর মধ্যে আনা হয়নি। খোদ কুরআনেই এক্সপেরিমেন্টাল সাইয়েন্সের সাথে জড়িত আয়াতের সংখ্যা ১৩৫০। কুরআনের ব্যাখ্যাদাতা ছিলেন মহানবী (সা.) নিজেই। তাঁর হাদীস গুলো দেখলে এই শিক্ষার দিগন্ত আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানব জাতির এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যা এই দুই সোর্সে পাওয়া যাবে না। এ ছাড়াও আল্লাহ আমাদের সুরা হাদীদ দিয়েছেন, বাক্বারাহ, আনআম, নামল, নাহল, আনকাবুত দিয়েছেন, শুআরা, ক্বাসাস কিংবা আম্বিয়া দিয়েছেন। আরো কত কি! জাতিসত্তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে কুরআন এমন ভাবে ঢেলে সাজায়, যা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। জ্ঞানের শাখা সমূহের এমন দিগন্ত উন্মোচন করে দেওয়া হয় যার প্রভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিমরা শিক্ষায় হয়ে পড়ে একমাত্র রেফারেন্স। কুরআনী শিক্ষা ব্যবস্থার সার নির্যাস হলো:

- এই শিক্ষায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির জানাজানির পথ উন্মোচিত হয়
- এখানে কোন নির্দিষ্ট দিক ও বিভাগ নেই, বরং যা- ই উপকারী তা সবই আসবে (ইলমুন ইয়ুন্তাফাউ বিহি)
- জ্ঞানের তৃষ্ণা তৈরিই এই শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
- এই শিক্ষা ব্যবস্থা হয় মেনটরিং বা (তারবিয়্যাহ) এর মাধ্যমে। যেখানে শিক্ষক হন নবুওয়াতের পথরাহী। (ইয়াতলু, ইয়ুযাক্কি, ইউয়াল্লিমুল কিতাব, ওয়াল হিকমাহ)। এই ব্যবস্থায় শিক্ষা পণ্য হয় না, শিক্ষা শুধু ট্রান্সফরম করা হয় না, বরং শিক্ষাকে প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা জীবন্ত করে রাখা হয়। এই জন্য এই শিক্ষায় কেও "শিক্ষিত বেকার" দেখতে পায়নি। যে ইলম দরকার হয় না, উপকার করে না, তা পরিতাজ্য শুধু নয়, আল্লাহর নাফরমানী হিসেবেও দেখা হয়েছে।
- এই শিক্ষা কেনো কাল, দেশ, রিসোর্স ও ব্যক্তি বিশেষের সাথে নির্দিষ্ট ছিলো না। এখানে বলা হয়েছে, আল হিকমাতু দাল্লাতুল মুমিন, আন্না অয়াজাদাহা ফাহুওয়া আহাক্কু বিহা। (জ্ঞান বিজ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই সে তা পাবে, তা অর্জনের সেই বেশি হকদার হবে)।
- শিক্ষা অর্জনকে আল কুরআন আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছে। তিনি শেখান, তাঁরই দেওয়া এই জ্ঞানের রাজ্য। (আর রহ-মান আল্লামাল কুরআন আল্লামা বিল ক্বালাম, আল্লামাল ইন-সানা মা লাম ইয়ালাম)

বিশ্ব-পণ্ডিত ও বিশ্ব-শিক্ষক:

আল কুরআন শিক্ষার মূল প্রণোদনা ঠিক করে দিয়েছে। তা হলো পৃথিবীর তাবত মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনা। কাজেই একজন শিক্ষিত মানুষকে দাঈ ইলাল্লাহ হতে হয়। শত্রুকে বন্ধু বানাতে হয়। যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে শাণিত প্রমান দিয়ে ইসলামের রূপ তুলে ধরতে হয়। দেশ থেকে দেশান্তরে বের হতে হয় শিখতে ও শেখাতে।

শিক্ষার বাস্তবায়ন:

একটা জাতিকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার পর আল কুরআন চায় সেই শিক্ষার বাস্তবায়ন। যেহেতু এই শিক্ষার প্রধান প্রেরণা হলো আল্লাহ কেন্দ্রিক, কাজেই কুরআন মানুষকে আল্লাহর পথে থাকতে প্রথমে কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে গড়ে তোলে। তার প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ইবাদাত করা লাগে। এই ইবাদাতগুলোর সবাটাকে তিনটি স্রোতে প্রবহমান করেছে:

১-প্রতিটি ইবাদাত একজন ব্যক্তির একেকটা দিকের আত্ম-সংশোধন, ব্যক্তি গঠন, ও চেতনার উন্মিলনের জন্যই অত্যন্ত সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে

২-প্রতিটি ইবাদাতকে জাতির যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সে হোক দৈহিক, অর্থনৈ-তিক, সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক। আবার সামষ্টিকভাবে সেগুলো বাধ্যতামূলক ও করে দিয়েছে। কাজেই কুরআন সমাজ-রাষ্ট্র, জাতি ও গোষ্ঠিকে খুবই সংঘবদ্ধ করে রাখতে চায়। গোটা মানব জাতিকে একটা দেহের মতই করে কুরআন দেখতে চেয়েছে।

৩- ইবাদাতের স্বরূপ সঠিক রাখার জন্য এর প্রচলন একমাত্র আল্লাহর হাতে রেখেছেন। ইবাদাত তাই স্বকপোলকল্পিত হবে না। অন্যের জন্য হবে না। একে বিদআহ ও শিরক নামে আখ্যায়িত করে তা থেকে সমাজ ও জাতিকে রক্ষা করতে বলেছে।

জাতিসত্তা বিকাশে রাষ্ট্র ও সমাজ:

মানবজাতিকে আল্লাহ দুনিয়ায় দুই কাজে নিয়োজিত দেখতে চান। একটা হলো খেলাফত। অন্যটা হল ইবাদাত। এই দায়িত্ব দুইটায় পরিপূর্ণ আঞ্জাম দিতে তাই দরকার হয় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বৈশ্বিক সম্পর্ক তৈরি। আল-কুরআন একটা জাতিসত্তার সুষ্ট বিকাশের জন্য তাই এইগুলোকে জোর দেয়। পরিবার গঠন ও পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি ও নির্ধারণ কুরআন বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছে। সমাজের শক্তি ও তার প্রয়োগকে কুরআন মানব জাতির আশির্বাদ মনে করেছে। এরজন্য আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারকে বাধ্যতামূলক করেছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তাকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম তথা জিহাদ ও ক্বিতাল ফরজ করে দিয়েছে। এইভাবে জাতিসত্তার বিকাশে কুরআন আমাদের জান্নাতি

পথ দেখায়।

জাতিসত্তা বিকাশে অর্থ ব্যবস্থা:

একটা জাতি উন্নত হয় তার স্বচ্ছলতা ও আত্ম-নির্ভরতার মাধ্যমে। কুরআন আমাদের সে ক্ষেত্রে পথ দেখায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে। আল কুরআন অর্থনৈতিক দিককে মুসলিম জাতির জন্য এই অবধারিত দিক বলে গণ্য করেছে। এই সংক্রান্ত মূল কথা হলো:

অর্থ ছাড়া মানবজাতির জীবন চলে না। কাজেই এ দিকে মুমিনদের দৃষ্টি দিতে হবে। মনে রাখতে হবে সম্পদের মালিক আল্লাহ। তিনিই দেন, তিনিই কেড়ে নেন। কাজেই তা হাতে আনতে চেষ্টা করতে হবে। হাতে এলে সঠিকভাবে খরচ করতে হবে। মুসলিম জাতি ভিক্ষুক হতে পারে না, এই জাতির মাঝে দারিদ্র্য থাকতে পারে না। আবার এখানে পুঁজিবাদি কেউ হতেও পারে না, কৃপণতা এখানে জাতীয় শত্রু।

মানুষকে শোষণের যে সব অর্থনৈতিক হাতিয়ার আছে কুরআন তার সব অকেজো করে দেয়। এমন কি সুদের মত কাজে কেউ জড়িয়ে পড়লে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর যুদ্ধ ঘোষণা থাকে।

জাতিসত্তা বিকাশের লক্ষ্যে কুরআন এমন কিছু ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করতে বলে যেখান থেকে আসতে পারে একটা জাতির উন্নতি, স্বস্তি, আভ্যন্তরীণ সংহতি ও শান্তি। (মাসারিফুয যাকাত)।

উৎপাদন, সংরক্ষণ, ইনকাম ও বন্টন ইত্যাদিতে কুরআন যে নীতিমাল দিয়েছে, তা মানলে মুসলিম জাতিসত্তা সর্বযুগে একটা অনুকরণীয় শুধু হবে না, অত্যন্ত উঁচুতে লিখতে পারে তার নাম।

জাতিসত্তা বিকাশে সভ্যতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি:

একটা জাতির উন্নয়নের রূপ-রেখা ফুটে ওঠে তার সাহিত্যে, তার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে, তার ইতিহাস ঐতিহ্যে, তার সভ্যতার নিদর্শনে। কুরআন দিয়েছে এই ব্যপারে এমন সব উপকরণ যা দিয়ে একক জাতি হিসেবে মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি দিন ধরে বিশ্ব নেতৃত্বে অবস্থান করেছে। শুধু মুসলিম সম্রাজ্যে নয়, যেখানে যেখানে মুসলিম জাতির পদরেখা পাওয়া যায়, সেখানে কিছু না কিছু মুসলিম সভ্যতার অনন্য নিদর্শন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সে হিন্দু অধ্যুষিত দেশ ভারত হোক, কিংবা খ্রিস্টান অধ্যুষিত স্পেনে হোক, অথবা বৌদ্ধ এলাকার চীন হোক।

জাতিসত্তা বিকাশে সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা:

কুরআন দিয়েছে আসমানী শাসনের এমন এক রূপরেখা যা সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরে, এবং সর্বকালে প্রযোজ্য হয়। এটা ক্বাবীলার শাসনেও লাগানো যায়, উম্মাতের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে ব্যবহার করা যায়। সংকীর্ণ ভৌগোলিক স্থানে যেমন প্রয়োগ সম্ভব, সারা বিশ্বের খেলাফতেও তার নির্দেশনায় কাজ চালানো যায়।

এই শাসন ব্যবস্থার প্রয়োগ:

এক্ষেত্রে কুরআন যে চিত্রগুলো আমাদের সামনে দেখায় তা খুবই ইতিবাচক, ফ্লেক্সিবল ও আশা জাগানিয়া। আমি কয়েকটা উদাহরণ এখানে প্রসঙ্গত নিয়ে আসতে চাই:

(ক) ক্বিবলা: আদম (আ.), ইবরাহীম (আ.), মূসা (আ.), হারুন (আ.)
(খ) অমুসলিম রাষ্ট্রের মন্ত্রী: ইউসুফ (আ.)
(গ) কোন মুসলিম ও ভালো বাদশাহের অধিনে থেকে সেনাপতিত্ব: দাউদ (আ)
(ঘ) সারা বিশ্বের শাসকঃ সুলাইমান (আ.), যুলকারনায়ন
(ঙ) নবুয়াতী রাষ্ট্রঃ মুহাম্মাদ (সা.)
(চ) খেলাফতী রাষ্ট্রঃ ৪ খলিফা
(ছ) রাজতন্ত্রঃ উমার ইবন আব্দুল আজিজ

এইভাবে কুরআন আমাদের সামনে জাতিসত্তা বিকাশে অনবদ্য ইশতিহার দান করে যা ধরে চললে আজকেও আমরা আবার মুখ উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।

উপসংহার:

আমরা চেষ্টা করেছি জাতিসত্তা বিকাশে কুরআন আমাদের কীভাবে সামনে এগিয়ে নেয়, পথ দেখায়, কিংবা প্রশিক্ষিত করে। এই কুরআন নাযিল যে মাসে হয়েছে, তার কোলে থেকে আমরা সময়গুলো অতিক্রম করে যাচ্ছি। যে মুসলিম জাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন খোদ ইবরাহিম (আ), এবং তার একটা প্রতিকী নাম ও দিয়েছিলেন তিনি, যে দর্শন মাথায় নিয়ে বিশ্ব উম্মাত সৃষ্টির কাজ ঈসা (আ.) করেছিলেন সে দর্শন আজ কুরআনের মাঝেই পরিস্কার করে তুলে ধরেছেন আল্লাহ। সেই দর্শনের আলোকে আমাদের নবী (সা.) গড়েছিলেন বিশ্ব ব্যবস্থা, এবং তার প্রসার ঘটিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বস্থ সাথী সাহাবিগণ। যে ব্যবস্থা আবার শুরু হবে ইমাম মাহদির হাতে এবং পূর্ণতা পাবে ঈসা (আ.) এর মাধ্যমে। তখন হবে আল্লাহর সম্রাজ্যের পূর্ণতা প্রাপ্তি, আসবে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে স্বস্তি, এবং তার পরে আল্লাহ মানব সৃষ্টির পূর্ণ রূপ ফুটায়ে তুলে কিয়ামতের দিকে সৃষ্টিকে নিবেন।

আমাদের তাই উচিৎ ঐ উম্মাতের একজন সদস্য হিসেবে মহানবী (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সাহাবিগণের মত আন্তরিকতার সাথে কুরআন ও নবী আদর্শ বুকে ধরে ইমাম মাহদি আসার আগ পর্যন্ত কাজ করে "খিলাফাত আলা মানহাজিন নবুওয়াত" গড়ার কাজে ব্যপৃত হই। হয়ত এতেই আমাদের মানব পরম্পরার সেরা ব্যক্তিদের সাথে থেকে, সেরা জাতির মধ্যে থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করতে পারবো।

আল্লাহ আমাদের কবুল করুন, আমীন।

লেখক : ইসলামী চিন্তাবিদ লেখক ও গবেষক।

এবারের মিরাজে প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ডা. মুহাম্মদ আমিন

মিরাজের প্রাক্কালে ইসলামী বিশ্বাসের (স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে) মহিমা পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের জন্য এটি একটি নিবন্ধ। এটি জ্যোতির্বিদ্যা এবং মহাজাগতিক বিশ্বের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক এবং দ্রুত উন্নয়নশীল অগ্রগতির পটভূমি অন্বেষণ করে। ইসরা নিয়ে আলোচনা বা এর আধ্যাত্মিক দিকগুলিকে কভার করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

কেন এটা প্রাসঙ্গিক?

বৈশ্বিক জনসংখ্যা ও অর্থনীতির দিক থেকে মুসলিমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। অতএব, তারা দ্রুত বর্ধনশীল মহাজাগতিক মিশনে নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত নয়। তারা হয় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এবং উপকৃত হওয়ার জন্য অথবা মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার মতো অবস্থানে রয়েছে। উপরন্তু, মুসলমান হিসাবে আমাদের জীবন ক্রমাগত সূর্য, চাঁদ এবং মহাবিশ্বের অবস্থানকে ঘিরে আবর্তিত হয় আমাদের প্রতিদিনের নামাজ, রামাদ্বান, হজ্জ এবং তাদাব্বুরের ক্ষেত্রে। পরিশেষে বলা যায়, ৬০০ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সভ্যতার স্বর্ণযুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃত হিসেবে আমরা কী ইতিহাস ভুলে যেতে পারি?

মিরাজের পটভূমিঃ

১৪৪৪ বছর পূর্বে (হিজরতের এক বছর আগে) মিরাজ সংঘটিত হয়। যেমনটি আমরা জানি, মানবজাতির ইতিহাসে নবী (সা.) ছিলেন মহাশূন্যে প্রথম মানুষ , যিনি আকাশের সকল সৃষ্টি ও স্তর অতিক্রম করেছিলেন এবং সিদরতুল মুনতাহায় পৌঁছানোর পর সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। ইসরার সমগ্র যাত্রা, স্বর্গারোহণ এবং ফিরে আসার পুরো ঘটনাটি নবীদের ইতিহাসে অনন্য এই অলৌকিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক যাত্রায় নবী (সা.) অসংখ্য মুজিজাহ'র অভিজ্ঞতা লাভ করেন, যেমন অতীতের ঘটনাসমূহ এবং ভবিষ্যতের ঘটনাবলী (জান্নাতে বিলাল রা)।

জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত আয়াত

পবিত্র কুরআনে এমন অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার পাশাপাশি এই সমগ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ ও ধ্বংস সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা প্রদান করে। কিছু আয়াত নিম্নরূপ :

- আর স্মরণ করো ! ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতাকে বললেন হে আমার আব্বা! দেখো! আমি স্বপ্নে দেখলাম এগারোটি গ্রহ, সূর্য ও চন্দ্রকে, আমি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত হতে দেখেছি। [ইউসুফ ১২:৪]
- সূর্য ও চন্দ্র পূর্বনির্ধারিত কক্ষপথে ঘোরে (রহমান; ৫৫:৫)
- আর তিনিই সেইজন যিনি রাত ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন, আর সূর্য ও চন্দ্রকে , সবাই তার কক্ষপথে বিচরণ করে।(আল

আমবিয়া; ২১: ৩৩)

- সূর্য তার চলার পথে একটি স্থির স্থানে চলে যায়। এ হচ্ছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়ের বিধান।(ইয়াসিন; ৩৬:৩৮)
- সূর্যকে চন্দ্রকে পাকড়াও করার অনুমতি নেই এবং রাত্রিও দিনকে অতিক্রম করতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে (ইয়াসিন, ৩৬:৪০)।
- নিঃসন্দেহ তোমার প্রভুর কাছে একটি দিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান। (হাজ্ব ২২:৪৭) (মিল্কি ওয়ের আলোকবর্ষে এক দিন ২২০ মিলিয়ন বছরের সমতুল্য: আপেক্ষিকতার তত্ত্বঃ।
- আর আমরা তোমাদের উপরে সৃষ্টি করেছি স্বর্গের সাতটি স্তর (২৩:১৭, ৮৬) এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে মহাকাশ সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত।
- নিঃসন্দেহ আমরা সুশোভিত করেছি সর্বনিম্ন আকাশকে তারা দিয়ে সজ্জিত করার জন্য, আস সাফফাত (৩৭:৬) জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাদের নাম দিয়েছেন গ্রহ, চাঁদ, তারা, সৌরজগত, মিল্কিওয়ে, গ্যালাক্সি, সুপার গ্যালাক্সি।
- স্বর্গের শপথ যেখানে পথ রয়েছে (৫১:৭)
- আল্লাহ্ র কাছ থেকে যিনি স্বর্গোদ্যানের পথের প্রভু, নিঃসন্দেহ এ-সব হচ্ছে ফিরিশ্ তাদের জন্য পথসমূহ, রাসূল (সা.) এর মধ্যে একটিকে মিরাজের সময় নিয়েছিলেন।
- যখন সূর্য নিভে যাবে এবং যখন নক্ষত্রের পতন হবে(তাকভির; ৮১; ১ ও ২) (বাদামী বামন নক্ষত্রের পর্যায়সমূহ: স্পন্দনশীল ও লাল দৈত্য পর্যায়)।
- আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে (কিয়ামাহ;৭৫:৯) যখন শক্তি শেষ হয়ে যাবে, তখন সূর্য গ্রহ সমূহকে গ্রাস করবে।
- তারকারা নির্দেশনার জন্য (আনআম ; ৬ : ৯৭)

(জ্যোতিষশাস্ত্র : মেরু তারকা; লাইট হাউস: পদার্থবিদ্যা: সেক্সট্যান্ট দ্বারা দিকনির্দেশ পরিমাপ করা যায়)

নবীজীর (সা.) অনুপ্রেরণাঃ

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.)-এর অভ্যাস ছিল তাহজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে উঠার পর আকাশের দিকে তাকালে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করতেন:

- নিঃসন্দেহে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে

(ইমরান; ৩:১৯০)

তিনি সূর্যগ্রহণ ও ইস্তিস্কার জন্য সালাহ সহ সমস্ত দৈনিক প্রার্থনা এবং অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান (উপবাস, হজ্জ) পরিচালনা করেছিলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে সূর্য, চাঁদ ও আকাশকে গভীরভাবে লক্ষ্য করা প্রার্থনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানঃ

মুসলিমরা বিভিন্ন কারণে প্রথম দিন থেকেই আকাশের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা শুরু করে (নামাজের সময়, চাঁদের চক্র, চন্দ্র ক্যালেন্ডার, কাবার দিকনির্দেশনা, তাদাব্বুর)। কাজেই এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে আকাশে ওড়ার প্রথম পরীক্ষাটি করেছিলেন প্রায় ৭০ বছর বয়সী একজন মুসলিম ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে। রাইট ভাতৃদ্বয় তাদের প্রাথমিক বিমান আবিস্কারের কারণে বিখ্যাত হয়েছেন। অধ্যাপক আল হাসানি যথার্থই উল্লেখ করেছেন: বিমান চালনার সমস্ত ইতিহাস, এমনকি মহাকাশ ভ্রমণের শুরু হয়েছিল একজন মানুষের বিনম্র সূচনা দিয়ে, আব্বাস ইবনে ফিরনাস, যিনি তার ঈগলের পালক এবং সিল্ক দিয়ে তৈরী গ্লাইডার দিয়ে উড্ডয়নের জন্য তার ধারণাগুলি পরীক্ষা করার প্রথম একজন ছিলেন। (পৃষ্ঠা ৩১৩)

৮ম শতাব্দী থেকে মুসলমানদের দ্বারা যুগান্তকারী আবিষ্কারঃ

আমাদের নিজস্ব ছায়াপথের বাইরে একটি তারার সিস্টেমের প্রথম রেকর্ডটি ৯৬৪ সালে একজন ইরানী জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবদ আল-রহমান আল-সুফি (৯০৩ থেকে ৯৮৬) আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি এটিকে মেঘ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং এখন আমরা একে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি বলে জানি।

চাঁদের গতির তৃতীয় বৈষম্য সম্পর্কে অধ্যাপক আল হাসানি মন্তব্য করেছেন: একজন মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যিনি কায়রোতে বাস করতেন এবং ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তিনি চাঁদের গতির তৃতীয় বৈষম্য আবিষ্কার করেছিলেন যাকে বলা হয় চাঁদের প্রকরণ। টলেমি (৮৫-১৬৫) প্রথম ও দ্বিতীয় সম্পর্কে জানতেন। তিনি মুহাম্মদ আবু আল-ওয়াফা আল-বুজ্জানির নামে ইউরোপে পরচিত। ইউরোপে, গতির এই তৃতীয় বৈষম্য, ছয় শতাব্দী পরে প্রায় ১৫৮০ সালে টাইকো ব্রাহে পুনরায় আবিস্কার করেন। এটি যখন নতুন বা পূর্ণ হয় তখন এটি দ্রুততম গতিতে চলে যায়, এবং প্রথম এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ধীরতম থাকে,। (পৃষ্ঠা ৩০৩)।

তিনি আরও বলেন: রেনেসাঁর সময়, রেজিওমন্টানোস, ১৫ শতকের একজন বিখ্যাত গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী, উত্সের জন্য মুসলিম বইগুলির উপর নির্ভর করতে হয়েছিল, যেখানে কোপার্নিকাস তার বই ডি রেভোলিউশনিবাস এ দশম ও একাদশ শতকের মুসলিম বিজ্ঞানী আল-জারকালি এবং আল-বাত্তানিকে বারবার উল্লেখ করেছেন। বেশিরভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি প্রাচ্যের মানমন্দিরগুলিতে ঘটেছিল, তবে পঞ্চাশ বছর ধরে মুসলমানরা স্পেনের টলেডো শাসন করেছিল, এটি ছিল বিশ্ব জ্যোতির্বিদ্যার কেন্দ্র। এখানে তৈরি নতুন জ্যোতির্বিজ্ঞানের টেবিল দুই শতাব্দী ধরে ইউরোপে ব্যবহৃত হয়েছিল। (পৃষ্ঠা ২৮২) বিশেষ করে ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রে, মুসলিম ভূমিতে যে অগ্রগতি হয়েছে তা পশ্চিমা রেনেসাঁর জ্যোতির্বিদ্যা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল। (পৃষ্ঠা ২৮৩)।

আধুনিক যুগের জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি স্থাপনকারী মুসলমানদের দ্বারা তৈরি করা যন্ত্রপাতি হল:

১। মহাজাগতিক গোলক
২। আর্মিলারি গোলক
৩। সর্বজনীন অ্যাস্ট্রোল্যাব
৪। সেক্সট্যান্টস
৫। প্রথম ভূ-গোলক, আল ইদ্রিসি (১০৯৯-১১৬৬), সিসিলি।
৬। তারকা মানচিত্র
৭। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিখুঁত সারণি।

এটি ৮ম শতাব্দীতে বাগদাদ ও দামেস্কে ইতিহাসের প্রথম অবজারভেটরি (খলিফা মামুন: ৮১৩-৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে) দিয়ে শুরু হয়। অন্যান্য বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মধ্যে অবজার্ভেটরি রয়েছে: মারাঘা মানমন্দির (নাসির আল দিন আল তুসি); উলুগ বেগের সমরকন্দ মানমন্দির, ইসফাহানের মালিক শাহ মানমন্দির এবং সুলতান মুরাদ তৃতীয় দ্বারা ইস্তাম্বুল মানমন্দির (তাকি উদ্দীন)।

সূচনা কাজের স্বীকৃতি

১৬৫১ সালে, ইতালির জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক, জোয়ানস রিকসিওলি অ্যালমাজেস্টাম নোভাম নামে জ্যোতির্বিদ্যার উপর একটি বিস্তৃতসহ সংকলন করেন। এই বইতে তিনি মধ্যযুগের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নামে Lunar formation নামকরণ করেছেন তাদের মধ্যে দশজন মুসলিম জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ ছিলেন।

১৯৩৫ সালে, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ৬৭২ টি চন্দ্র গঠনের নাম দিতে সম্মত হয়েছিল: তেরোটি গঠনের নাম মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নাম দেওয়া হয়েছিল, মেসালা; অ্যালমানন; আলফ্রাগানাস; আলবেতেগিনাস; থিবিট; অ্যাজোফি; আলহাজেন; আরজাচেল; গেবার; নাসিরউদ্দিন; আলপেট্রোজিয়াস; আবুলফেদা; উলুগ বেগ।

১৬৫ টিরও বেশি তারকাদের আরবি শিরোনাম রয়েছে যেমন জেনিথ; আজিমুথ; ভেগা; আলটেয়ার; দেনব প্রমুখ।

দ্রুত পরিবর্তনশীল আমাদের বিশ্ব:

তথ্য প্রযুক্তি এখন বিশ্বকে শাসন করছে এবং এইভাবে বিশ্বের জনসংখ্যা অনেক বেশি সংযুক্ত হয়েছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সামাজিকীকরণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং আরও অনেক কিছু শেয়ার করা হচ্ছে বা কম-বেশি সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করছে যেনো একটি সুপরিচিত একক মানব সমাজ। গ্লোবাল ভিলেজ ধারণাটি এখন গ্লোবাল ফ্যামিলিতে পরিণত হয়েছে। মহামারী COVID19 এখন বিশ্বকে এক নতুন মাত্রায় রূপ দিচ্ছে।

গত অর্ধ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিদ্যার উন্নয়ন:

গত কয়েক দশক ধরে জ্যোতির্বিদ্যা এবং মহাজাগতিক জগতে অগ্রগতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রথম টেলিস্কোপ (১৬০৮ সালে একজন ডাচ অপটিশিয়ান দ্বারা উদ্ভাবিত) মানুষের জন্য আকাশকে আরও কাছে নিয়ে আসে। প্রথম মানুষ (নীল আর্মস্ট্রং) ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে চাঁদে পা রাখেন। হাবল হল মহাকাশ টেলিস্কোপের আইকন (১৯৯০ সালে চালু করা হয়েছিল)। এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিকৃতির বাইরে প্রদক্ষিণ করে এটি অত্যন্ত কম আলোয় স্থল ভিত্তিক টেলিস্কোপের চেয়ে উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি তুলতে দেয়। স্টেশনটি একটি মাইক্রো মাধ্যাকর্ষণ এবং মহাকাশ পরিবেশ গবেষণাগার হিসাবে কাজ করে যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয় জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, আবহাওয়া বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে। আইএসএস চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দীর্ঘ-মেয়াদী মিশনের জন্য প্রয়োজনীয় স্পেস ক্রাফট সিস্টেম এবং যন্ত্রপাতি পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত। ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, ২৫১ মহাকাশচারী, মহাকাশচারী এবং ১৯টি বিভিন্ন দেশের মহাকাশ পর্যটকের মধ্যে মাত্র ১ জন মালয়েশিয়ান এবং ১ জন আমিরিতি।

অন্যান্য সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল:

নাসার প্রোব সূর্যের পৃষ্ঠকে স্পর্শ করেছে (২০২১)

• চীনের তৈরী (৮ ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার) কৃত্রিম সূর্য সূর্যের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি গরম (১৫৮ মিলিয়ন ডিগ্রী ফারেনহাইট)

ভারত ও তুরস্ক চাঁদে যাওয়ার জন্য লাইনে আছে।

• নাসার মহাকাশ যান মঙ্গলগ্রহে নিবিড়ভাবে কাজ করছে [এমআরও; ২০০৬]

• স্পেস টেলিস্কোপে নতুন যুগ শুরু হয়েছে (১৯৮৫ সাল থেকে): বিদায় হাবল, স্বাগতম JWST

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ [JWST]:

বিশ্বের (নাসা) সবচেয়ে ব্যয়বহুল (১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং অত্যন্ত পরিশীলিত স্পেস টেলিস্কোপ ২৫ ডিসেম্বর, ২০২১ এ চালু করা হয়েছে (১৮ টি ষড়ভুজাকার আয়না)

• সূর্যের কক্ষপথে ১.৫ মিলিয়ন কিলোমিটার (L2 পয়েন্ট,) এর গন্তব্যে পৌঁছেছে

• পরবর্তী পদক্ষেপ: কুল ডাউন (প্রায়-৪০০ ফারেনহাইট), সারিবদ্ধকরণ, ক্রমাঙ্কন এবং অবশেষে স্পেস মিশন

• পূর্বাভাসিত জীবনকাল: ১০ + বছর

• হাবলের মতো এটি পরিষেবাযোগ্য নয়।

• প্রথম পর্যায়ের প্রান্তিককরণ ১৮.০২.২০২২-এ সম্পন্ন হয়েছে

• পরিকল্পিত গবেষণা শুরু হতে আরও ৫ মাস সময় লাগবে।

• ব্যাপকভাবে উন্নত ইনফ্রারেড রেজোলিউশন এবং সংবেদনশীলতার সাথে, এটি হাবলের জন্য অনেক পুরানো এবং দূরবর্তী বস্তুগুলিকে দেখবে- কিছু ১০০ গুণ পর্যন্ত ক্ষীণ। এটি জ্যোতির্বিদ্যা এবং মহাজাগতিক ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত তদন্তকে সক্ষম করবে বলে আশা

করা হচ্ছে, যেমন প্রথম তারার পর্যবেক্ষণ এবং প্রথম ছায়াপথের গঠন, সেইসাথে সম্ভাব্য বাসযোগ্য এক্সোপ্ল্যানেটগুলির বিশদ বায়ুমণ্ডলীয় বৈশিষ্ট্য।

JWST অদূর ভবিষ্যতে কি সম্ভাব্য পরিবর্তন আনছে?

শীঘ্রই মহাবিশ্বের গভীর অংশের অবিশ্বাস্য প্যানোরামিক দৃশ্য ২৪/৭ লাইভ পাঠানো শুরু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, বিজ্ঞানীরা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করবেন: এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির ইতিহাস, বিগ ব্যাং, ব্ল্যাক হোল, হোয়াইট হোল, ইকো প্ল্যানেট, তারার জন্ম ও মৃত্যু, গ্যালাক্সি, মিল্কিওয়ে ইত্যাদি। পরবর্তী প্রশ্ন হল: ২০৫০ সালের মধ্যে কি পৃথিবীর বাইরে মানুষের বসবাস সম্ভব হবে? এমনকি নাসার সিনিয়র বিজ্ঞানীরাও এখন মহাকাশে পরবর্তী স্পেস টেলিস্কোপ নির্মাণের কথা ভাবছেন!

এই পরিবর্তনগুলি মানব সম্প্রদায় ও মুসলমানদের উপর কী প্রভাব ফেলবে?

যখন সরাসরি সম্প্রচার শুরু হবে (সম্ভবত ২০২২ সালের গ্রীষ্মের শেষের দিকে) তখন সমগ্র মানবজাতি অনির্দিষ্টকালের জন্য নাসার বিবৃতিগুলির জন্য উত্তেজিত এবং আগ্রহী থাকবে! যে কোনও শিক্ষিত মানুষের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে বিশেষকরে যুব সমাজের মনে। যেহেতু তারা ইতিমধ্যে সত্যভিত্তিক, তাই গায়েবের প্রতি নিঃশর্ত ও পূর্ণ আনুগত্যের মনোভাব কমে যেতে পারে (মুতাজিলাদের মতো) এমনকি অনেকেই পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনার অভাবে ইসলাম ছেড়ে চলে গেছে। এটি এখন একটি স্বীকৃত সমস্যা যা ডঃ ওয়াই কাধি সম্প্রতি উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, যদি না কুরআন ও সহিহ হাদিস (তরুণ মনের সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক ফলাফল এবং প্রশ্নগুলি সম্বোধন করে) সৃষ্টি, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়: আমরা তাদের অনুপ্রাণিত করতে এবং বিশ্বাসে দৃঢ় রাখতে ব্যর্থ হতে পারি (আকিদাহ)!

এই খেলায় মুসলমানদের ভূমিকা: কেবলমাত্র দর্শকের ভূমিকা বা এতে অংশগ্রহণ করা?

স্থিতাবস্থা আমাদের জন্য ভাল বিকল্প নয়। আসুন আমরা সক্রিয় হই; রক্ষণাত্মক অবস্থানে নয়। ১৪৯২ সালে কলম্বাসের যেমনটি হয়েছিলেন, আজকাল আমরা আমেরিকা আবিষ্কারের ইতিহাস পড়ে তেমন উত্তেজিত হই না। মহাকাশ ভ্রমণের আবির্ভাবের সাথে সাথে, এটি বিস্ময়কর নাও হতে পারে যদি একশত বছরের মধ্যে অন্য গ্রহ থেকে একজন তরুণ মুসলিম প্রথমবারের মতো হজ পালনের জন্য পৃথিবীতে আসে !!.

মানবতার কাছে আমরা কী বার্তা পৌঁছে দিতে পারি?

আমাদের প্রভুর বিশাল সৃষ্টির আবিষ্কারকে আমাদের স্বাগত জানানো এবং উদযাপন করা উচিত। এটি স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থা প্রমাণ করে। আমরা কি বিজ্ঞানী ও নভোচারীদের শুটিং স্টার (সাফাত ৬-১০) সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য কিছু ধারণা দিতে পারি? আমরা কি তাদের সৌরজগতে আরও একটি গ্রহের সন্ধানের জন্য অনুরোধ করতে পারি (ইউসুফ; ১২: ৪)। তারা এখন পর্যন্ত ১০টি আবিষ্কার করেছে।

আমরা কি করতে পারি?

এই নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই: শুধু আমাদের অবহেলিত বুদ্ধিবৃত্তিক উপকরণগুলি থেকে ধুলি সরাতে হবে এবং এটিকে সমসাময়িক আবিষ্কারগুলির সাথে শাণিত করতে হবে (আমাদের, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির উন্মোচন)।

আমার চিন্তা নিম্নরূপ:

• আসুন আমরা সার্বজনীনভাবে চিন্তা করি এবং বিশ্বব্যাপী কাজ করি।

• মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিষয়ে জ্যোতির্বিদ্যার সর্বশেষ আবিস্কার সম্বোধন করে আমাদের 'তাফসীর' এর নতুন সংস্করণ দরকার (তাফহিমুল কুরআন এবং ফি জিলালিল কুরআন অর্ধ শতাব্দী আগে আপ টু ডেট ছিল)।

• হাদিস সাহিত্যের সমসাময়িক ব্যাখ্যা প্রয়োজন যেমন সৃষ্টি, স্রষ্টা, কিয়ামাহর আগে ও পরে ঘটনা (আসকালানী (রা.) মৃত্যু-১৪৪৯; ত্বহাকী (রা.) এর মৃত্যু-৯৩৩)

• অদূর ভবিষ্যতে চাঁদ ও মঙ্গলের মতো পৃথিবীর বাহিরে গ্রহগুলিতে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন মানুষের বাসস্থান হিসাবে মুসলিম পণ্ডিতদের সমস্যাগুলি সমাধান করা উচিত: ১. কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারে যে মানুষকে আয়াত ২: ৩০ এর ভিত্তিতে পৃথিবীর বাহিরের সম্ভাব্য অধিবাসীদের জন্য ইসলাম অনুসরণ করতে হবে না। যাইহোক, ২১: ১০৭ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে যে মুহাম্মাদ (সাঃ) সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত, কারণ আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা। আলেমদের উচিত প্রতিদিনের নামাযের সময় সারণির বিষয়গুলোর সমাধান করা। পৃথিবীর কেবলা মক্কার সময়সূচি অনুযায়ী দৈনিক নামায, রোজার সময় ও ঈদের জন্য অনুসরণ করা যেতে পারে।

• মুসলিম বিজ্ঞানীদের এই সমস্যাটি সমাধান করা উচিত: মানবজাতি গ্রহ, মিল্কিওয়ে এবং অন্যান্য গ্যালাক্সিগুলি অন্বেষণ করার সর্বোত্তম চেষ্টা করছে যা প্রথম আকাশ/স্বর্গের সাথে সম্পর্কিত: এটি পরাক্রমশালী স্রষ্টার সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান বোঝার জন্য ভাল। যাইহোক, আমাদের নবী (সঃ) ১৪৪৪ বছর আগে একটি অলৌকিক বাহন বুরাক (আলো) নিয়ে স্রষ্টার সাথে দেখা করতে সপ্তম আসমানে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন।

• নিজেকে নিয়মিত আপডেট রাখুন। যোগাযোগের সমস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ান।

একটি গ্লোবাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি এবং থিংক ট্যাংক স্থাপন করা। মাশাল্লাহ মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছেন যেমন, কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন আবিষ্কার: সংগঠিত করা প্রয়োজন। আমরা কি ১৫৭৭ সালে সুলতান তৃতীয় মুরাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ইস্তাম্বুল অবজারভেটরি (তাকি উদ দীন) সক্রিয় করতে পারি?

• আমরা কি আহলুল কিতাব ভাইদের সাথে যোগ দিতে পারি (JWST বড়দিনে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল)।

NASA, ESA Ges CSA বিজ্ঞানীদের মধ্যে থাকা মুসলমানদের সংগঠিত করা।

• NASA, ESA Ges CSA-Gi সাথে OIC কেও যুক্ত করা।

• মুসলিম সহায়ক দল/স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা

• যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বাহিরের গ্রহগুলিতে মানুষের বসবাসের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে তাই আমরা কি এখন থেকে মহ-াকাশে একটি সমজিদ ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যেগ নিকে পারি?

• লেস্টার ইউনিভার্সিটি ESA এর অংশ: আমরা কি সেখারকার ইসলামিক সোসাইটির মাধ্যমে যোগাযোগ বাড়াতে পারি?

• তরুণ মুসলমানদের জ্যোতির্বিদ্যা, সৃষ্টিতত্ত্ব, জৈব-জ্যোতির্বিদ্যা এবং মহাকাশ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করুন।

• ওহীর সাথে সর্বশেষ অনুসন্ধানকে অন্তর্ভুক্ত করে মিরাজ আলোচনার (রামাদ্বানের মতো) নতুন মাত্রা বিকাশের কথা ভাবুন।

• একটি আগ্রহী গ্রুপ গঠন করা এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ করা।

• আমরা কি বিশ্বাসযোগ্য পণ্ডিতদের সাথে একটি বিশ্বব্যাপী ওয়েবিনারের আয়োজন করতে পারি যেমন. শেখ ডঃ ইয়াসির কাজী, অধ্যাপক আল হাসান, তুর্কি জ্যোতির্বিদ, মুসলিম যারা আইএসএস-এ কাজ করেছেন।

• যেখানে সম্ভব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আরও সক্রিয় হতে হবে।

তথ্যসূত্র

Quran : ১৭:১

Hadith regarding Isra & Mi'raj ; Bukhari 1149

(footstep of Bilal r in Paradise.)

Other Ayahs regarding the ultimate destruction of everything in the sky & the Earth : the Qiyamah : Araf (7 : 187) ; Nahl (16: 77); Naba (78 : 19-20) ; Muzzammil (73:14) ; Mursalat (77:10) ; Zalzalah (99 : 1- 5) ;

Qariah (101 : 1 -59)
Other Ayahs regarding 7 heavens : Baqarah (29, 164) ; Rad (13 :2) ; Hajj (22 : 65) ; Nur(71:15) ; Naba (78 : 12)

Other Ayahs : Furqan(25 : 61) ; Yunus (10 : 5) ; Hameem as Sajdah (41 ;12) ; Qaf (50:6) ; Hijr (15 ; 16) ; Mursalat (77 ; 8) ; Waqiah(56 ; 5) ; Infiter(82 : 2 -3)

www.jwst.nasa.gov

www.space.com

MuÕjamul Quran :www.ierfbd.org

Hubble : www.hubblesite.org

ISS : Wikipedia

European Space Agency : www.esa.int

1001 inventions : Muslim Heritage in our World by Prof Salim Al Hassani

Acknowledgments

Dr Shomsher Ali ; Retired Professor of DU ,BD

Dr Ghulam Moazzam (R) , Ex Principal of SMC

লেখক একজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক কিন্তু এই ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ নন। বিশ্বাসযোগ্য উৎস থেকে সর্বশেষ ফলাফলের সাথে ক্রমাগত আপডেট করা উচিত।

লেখক: ডাক্তার, ইসলামি গবেষক।

জিহ্বা ও ভাষার নিয়ন্ত্রণঃ সিয়াম থেকে শিক্ষা

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

আল্লাহ তায়ালা মানবদেহে হাত, পা, চোখ, কান, নাক, জিহ্বাসহ অনেক মূল্যবান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করেছেন। তিনি আল কুরআনে ইরশাদ করেন, আমি কি তাকে দুটো চোখ, একটি জিহবা ও দুটি ঠোঁট দেই নাই? আমি কি তাকে দুটি সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি- সুরা আল-বালাদ ৮-১০। আমরা চোখ দিয়ে বস্তু দেখি। কান দিয়ে শুনি। নাক দিয়ে গন্ধ অনুভব করি। পশুর মাঝেও এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। কিন্তু মানুষ আর পশুর মাঝে পার্থক্য হচ্ছে পশুর চোখের সামনে যা পড়ে তা দেখে বা শোনে। কিন্তু মানুষের দেখা ও শোনার মাঝে আল্লাহর পছন্দ বা অপছন্দের সীমারেখার প্রতি খেয়াল রাখা হয়। মানুষ আর পশুর মাঝে পার্থক্য এখানে।

আল্লাহ তায়ালা জিহ্বার মাঝে পানি দিয়েছেন। আমরা যখন কথা বলি বা খানা-পিনা করি জিহ্বায় পানি আসে। এর মাধ্যমে খাদ্য সহজে খাদ্য নালীতে যায়। আল্লাহ তায়ালা খাবারের প্রতি লোকমার সাথে পরিমিত পানি সৃষ্টি করে দেন। জিহ্বা দিয়ে আমরা টক-মিষ্টি-ঝাল আস্বাদন করি; কথা বলি। মনের ভাব প্রকাশ করি। কিন্তু শুধু জিহ্বা থাকলেই মানুষ কথা বলতে পারে না । এইজন্য বাকশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কথা বলার জন্য বাকশক্তি দান করেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছেন যারা বোবা কথা বলতে পারে না; কথা বলার নিয়ামত থেকে তারা চিরবঞ্চিত। আল্লাহ তায়া-লা বাকশক্তি দান করার পর মানুষকে নেকী ও গোনাহের দুটি পথ দেখিয়ে ইচ্ছামত বাকশক্তি ব্যবহারের শক্তি দান করেছেন । তাই মানুষ বাকশক্তি প্রয়োগ করে ভাল কথা; নেকীর যেমনি বলতে পারে তেমনি খারাপ কথা- গোনাহের কথাও উচ্চারণ করতে পারে। খারাপ কথা বলার সাথে সাথে আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাকশক্তি রহিত করে দিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেন না। তিনি জিহ্বাকে সিক্ত রেখেছেন সবসময় আল্লাহর যিকির করার জন্য। কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য। দাওয়াতী কাজ করার জন্য। সঠিক কাজে সঠিকভাবে যবান ব্যবহার করা এবং ফাহেশা ও হারাম থেকে যবান হেফাজত করা মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য। মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, অশ্লীল কথা বলা , ঝগড়া করা মস্ত বড় গুনাহ। অনেক মানুষ জিহ্বা ব্যবহার করে এই ধরনের পাপ করছে। তাই আল্লাহ তায়ালা জিহ্বা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল(সা.) জিহবা ও ভাষা হেফাজতের বাস্তব শিক্ষা দিয়েছেন।

আল কুরআনে লিসান শব্দের প্রয়োগ

আল কুরআনে লিসান শব্দটি কোথাও জিহ্বা আর কোথাও কোথাও মুখের ভাষা অর্থে ব্যবহিত হয়েছে। সুরা মায়েদাহর ৭৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে (লিসানে দাউদ ওয়া ঈসা)। সুরা ইবরাহীমের ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষা-ভাষী (লিসানে কাওমিহ) করেই প্রেরণ করেছি। যাতে তাদেরকে পরিষ্কার করে বুঝাতে পারেন। সুরা ত্বাহার ২৭ নম্বর আয়াতে 'উকদাতান মিন লিসানি' দ্বারা জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করার প্রার্থনা করা হয়েছে। সুরা মারইয়ামের ৯৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ' আপনি কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা পরহেজগারদের সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। সুরা কাসাসের ৩৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আমার ভাই হারুন সে আমার চেয়ে প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। সুরা কিয়ামার ১৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি

দ্রুত অহী আবৃত্তি করবেন না। সুরা বালাদের ৮-৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, '' আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদয়। জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়। কুরআনে লিসান শব্দের প্রয়োগ থেকে স্পষ্ট যে এটি জিহ্বা ও মুখের ভাষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

জিহ্বা ও ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রকৃত মুসলিম এর যবান নিয়ন্ত্রিত থাকে: হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যার হাত ও যবান থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে-বুখারী। এই হাদিসে লিসান শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কালাম শব্দ বলা হয়নি। কারণ অনেক মানুষ আছে মুক তারা কথা বলতে পারে না। কিন্তু মুখের অঙ্গভঙ্গি তথা জিহ্বা দ্বারাও অপরকে কষ্ট দিতে পারে। মুখের কথা বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ভদ্রতা আর অভদ্রতার পার্থক্য ফুটে উঠে। যাদের ভাষা নিকৃষ্ট তারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। এই কারণে রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না যতক্ষণ না তার অন্তর সঠিক হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর সঠিক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার জিহ্বা সঠিক না হবে- মুসনাদে আহমদ।

যে ব্যক্তি জবানের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না শয়তান তার দ্বারা অনেক কাজ করায় যা তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তালাক পর্যন্ত হয়ে যায় জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ না রাখার কারণে। এইজন্য রাসূলে কারীম (সা.) রাগের সময় নীরব থাকতে বলেছেন। ইবন জাওযী বলেন আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে অনেক মানুষ হারাম খাবার, যেনা বা চুরি থেকে বিরত থাকতে পারে কিন্তু জিহ্বার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকতে পারে না। হযরত সুফিয়ান ইবন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার জন্য সবচেয়ে ভয় করার বস্তু কি? তখন রাসূলে কারীম (সা.) স্বয় জিহ্বাকে বের করে তা হাত দিয়ে ধরে বলেন এটা। জিহ্বাকে ভয় করার অর্থ সাবধানতা অবলম্বন করা, সচেতনতার সাথে বাক্যপ্রয়োগ করা ; অনর্থক বাজে কথা না বলা। আমাদের সব কথা-বার্তা লিপিবদ্ধ করা হয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ' স্মরণ রেখো দুই গ্রহণকারী ফিরিশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যা উচ্চারণ করে তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে। যে লেখার জন্য সদা প্রস্তুত- সুরা কাফ ১৭-১৮। সুফিয়ান সাওরী একদিন তার সঙ্গীদেরকে বলেন তোমাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, যে তোমাদের কথা সুলতানের কাছে পৌছে দিবে, তোমরা কি কোন বলা বলবে? সঙ্গীরা বললেন জি না। তিনি তখন বললেন তাহলে জেনে রাখ তোমাদের সাথে এমন লোক আছেন যিনি কথা পৌছান অর্থাৎ ফেরেশতাগণ।

জিহ্বা একদিকে মানুষের বন্ধু অপরদিকে বড় এক শত্রু। জিহ্বাকে মানব দেহের বডিগার্ড বলা হয়। কোন বাড়ীর গার্ড যদি অসুস্থ হয়ে যায় যেমনি বাড়ীর নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। তেমনিভাবে কারো জিহ্বা অসংযত হওয়ার রোগে আক্রান্ত হলে সেই ব্যক্তি কাকে কি বলে এই নিরাপত্তাহীনতায় সকলে ভোগে। তাই রাসূলে কারীম (সা.) জিহবা সংযমের নির্দেশনা দান করেছেন। হযরত উমর বলেন রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন যে ব্যক্তি জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ রাখেন আল্লাহ তায়ালা তার দোষ ঢেকে দেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুটো কান আর একটি মুখ দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে বেশী শুনতে হবে। আর বলতে হবে কম। অনেক মানুষ সব সময় বেশী কথা বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু প্রয়োজনের আলোকে কথা বলা দোষণীয় নয়। আমাদেরকে তিন অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় জিহ্বাকে রাখতে হবে: ১. সৎ কাজের আদেশ বা অসৎ কাজের নিষেধ ২. আল্লাহর যিকির ৩. চুপ থাকা

জিহ্বা নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা

আখিরাতে নাযাতের পথ বাক সংযম: আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন, সেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা হাত ও পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে- সুরা নূর ২৪। হযরত উকবা বিন আমের থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল আখিরাতে নাযাত পাওয়ার উপায় কি? তিনি জবাব দিলেন তোমার কথা বার্তা সংযত রাখ; তোমার ঘরকে প্রশস্ত কর (অর্থাৎ মেহমানদারী কর) এবং তোমার কৃত আমলের জন্য আল্লাহর কাছে কান্না কাটি কর- তিরমিযী। হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন, মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠলে সকল অঙ্গপ্রতঙ্গ জিহ্বাকে অনুনয় বিনয় করে বলে তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তুমি যদি সঠিক পথে থাক আমরাও সঠিক পথে থাকতে পারি। আর তুমি যদি বাকা পথে চল তাহলে আমরাও বাকা পথে যেতে বাধ্য-তিরমিযী।

জবানের হিফাজতে জান্নাতের গ্যারান্টি: হযরত সাহল ইবন সাদ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে ব্যক্তি তার দুচোয়া-লের মধ্যবর্তী বস্তু অর্থাৎ জিহ্বা এবং তার দুই উরুর মধ্যবর্তী তথা লজ্জাস্থানের যিম্মাদার হবে আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব- বুখারী।

জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার শাস্তি

যবানের কারণে জাহান্নামের শাস্তি: হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একবার মায়ায ইবন যাবাল আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল আমরা যা কিছু বলি তা নিয়ে কি আমাদের পাকড়াও করা হবে। তখন আল্লাহর রাসূল বলেন হে মুয়ায জবান হেফাজত না করার কারণে মানুষকে উপুর করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে- তিরমিযী।

কথার সিয়াম

ইসলাম পূর্বকালে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোজাও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কারণে হযরম মারইয়াম এর কথা কুরআনে এই ভাষায় উল্লেখ করেন যে, ; তুমি বলে দিও আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোজা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না (ইন্নি নাযারতু লিররাহমানি সাওমা ফালান উকাল্লিমা আলইয়াওমা ইনসিয়্যা) মারইয়াম: ২৬। ইসলাম কথা বর্জনের

এই ধরনের সিয়াম রহিত করেছে। রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতিম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কথা বর্জন কোন ইবাদত নয়।

ইসলাম কথার সিয়াম রহিত করলেও হিফজুল লিসানকে রোজার গুরুত্বপুর্ণ অনুসঙ্গ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। রাসূলে কারীম (সা.) বলেন কেউ যদি কোন রোজাদারকে গালি দেয় সে যেন তার জবাব না দেয় বরং বলে ইন্নি সায়েম আমি রোজাদার।

আল্লাহর রাসূল আরও বলেন এমন অনেক রোজাদার আছে যাদের রোজা ক্ষুধা ও পিপাসার্ত থাকা ছাড়া আর কোন কাজে আসে না।

যারা মিথ্যা ও ফাহেশা কথা ছাড়েনা তাদের রোজা কোন কাজে আসে না।

সাধারণ কথা বার্তা ত্যাগ করা ইসলামে ইবাদত নয়। তবে মন্দ কথাবার্তা, গালিগালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি রহিত করে দিয়েছে। তাই একজন রোজাদারের রোজা থেকে ফায়দা পেতে হলে তাকে জিহ্বা ও ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

জিহ্বা ও ভাষার নিয়ন্ত্রণে যা বর্জনীয়

অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা : সুরা মু'মিনূনের ১-৩ আয়াতে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে 'অবশ্যই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে যারা নিজেদের সালাতে বিনম্র। যারা অনর্থক ক্রিয়া কলাপ থেকে বিরত থাকে'। এই আয়াতে উল্লিখিত লাগউন শব্দের অর্থ অনর্থক কথা বা কাজ। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চাইলে আমাদেরকে অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূলে কারীম (সা.) বলেন ব্যক্তি ভাল মুসলিম হওয়ার একটি বৈশিষ্ট্য হল অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা-তিরমিযী। হযরত লোকমান হাকীমকে প্রশ্ন করা হল আপনাকে কোন জিনিস বিজ্ঞ করেছে? তিনি জবাব দিলেন 'আমি অনর্থক কোন কথা বলি না'।

গালি দেওয়া: মুমিন কাউকে গালি দেয় না বা অশ্লীল কথা বলে না। রাসূলে কারীম (সা.) বলেন মুমিন দোষ চর্চাকারী হয় না; লানতকারী, অশ্লীল ও গালিগালাজকারী হয় না বাজে কথা বলে না- তিরমিযী। রাসূলে কারীম (সা.) বলেন কোন মুসলিমকে গালি দেওয়া ফিসক (গুনাহের কাজ) আর তাকে হত্যা করা কুফর (বুখারী ও মুসলিম)। রাসূলে কারীম (সা.) বলেন চারটি মন্দ স্বভাব আছে এগুলো যার মধ্যে থাকবে সে খালেস মুনাফিক বলে গণ্য হবে। এই চার স্বভাবের একটি কারো মাঝে থাকলে তার মাঝে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থাকল। যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে। ১. আমানত রাখলে খেয়ানত করে ২. কথা বলে তো মিথ্যা বলে। ৩. প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে ৪. তর্কের সময় গালি গালাজ করে- বুখারী। মানুষ অনেক সময় রাগের সময় গালি গালাজ করে। তাই রাসূলে কারীম (সা.) বলেন কেউ যখন রেগে যায় সে যেন চুপ হয়ে যায়- মুসনাদে আহমদ। রাসূলে কারীম (সা.) আরও বলেন সব চেয়ে বড় কবীরাহ গুনাহ হল ব্যক্তি তার মা বাবাকে গালি দেওয়া। একথা শুনে সাহাবারা বললেন নিজের মা বাবাকে মানুষ আবার গালি দেয় কীভাবে? উত্তরে আল্লাহর রাসূল বললেন, ব্যক্তি কারো মা বাবাকে গালি দেয়

যবানের কারণে জাহান্নামের শাস্তি: হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একবার মায়ায ইবন যাবাল আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল আমরা যা কিছু বলি তা নিয়ে কি আমাদের পাকড়াও করা হবে। তখন আল্লাহর রাসূল বলেন হে মুয়ায জবান হেফাজত না করার কারণে মানুষকে উপুর করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে- তিরমিযী।

তখন সে গালিদাতা তার মা বাবাকে গালি দেয়- বুখারী।

ফাহেশা-অশ্লীল কথা বলা : হযরত আবু দারদা থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল বলেন কিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য মীযানের পাল্লায় সৎ ব্যবহারের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছু হবে না। আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল ও কটুভাষীকে অবশ্যই ঘৃণা করেন- তিরমিযী। রাসূলে কারীম (সা.) বদর যুদ্ধে যেসব কাফের নিহত হয়েছে তাদেরকে গালি দিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, তোমরা অশ্লীলতা থেকে বাঁচো আল্লাহ তায়ালা অশ্লীলতা ও সীমালঙ্ঘন পছন্দ করেন না।

মিথ্যা কথা বলা : মিথ্যা সকল পাপের মূল। মুমিন মিথ্যা বলতে পারে না কারণ মিথ্যা মুনাফিকের স্বভাব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলে তখন এর দুর্গন্ধে ফেরেশতারা তার থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়-তিরমিযী। হযরত মুয়াবিয়া ইবন হাইদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন দুর্ভোগ তার জন্য যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলে। দুর্ভোগ তার জন্য দূর্ভোগ তার জন্য- আবু দাউদ। আল্লাহর রাসূল (সা.) একবার সাহাবাদেরকে বললেন আমি কি তোমাদেরকে সব চেয়ে বড় কবীরাহ গুনাহ সমুহে কথা বলে দিব? সাহাবাগণ বললেন অবশ্যই বলুন আল্লাহর রাসূল। তখন নবী করীম (সা.) বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা। মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া (এতটুকু বলা পর্যন্ত নবী করিম (সা.)হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এরপর নবীজি হেলান দেওয়া থেকে বসে বললেন আরো ভাল করে খেয়াল রাখ বড় কবীরাহ গুনাহ সমূহের অন্যতম হল মিথ্যা বলা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা বলা। নবীজি অতি গুরুত্বের সাথে এই কথা বারবার বলতে লাগলেন। এটা দেখে আমরা মনে মনে ভাবলাম নবীজির তো কষ্ট হচ্ছে। নবীজি যদি একট চুপ করতেন- বুখারী। আল্লাহর রাসূল আরও বলেন তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাক। নিশ্চয়ই মিথ্যা পাপের পথে নিয়ে যায়। আর পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায়।

মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া: মুমিন কখনও মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারে না। আল্লাহ সুরা ফুরকানের ৭২ নম্বর আয়াতে মুমিনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ইরশাদ করেন, ' যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। অসার ক্রিয়া কথার সম্মুখীন হলে ভদ্রতার সাথে পরিহার করে অতিক্রম করে'। আল্লাহর রাসূল বলেন তোমরা শুনে রাখ বড় কবীরাহ গুনাহের অন্যতম হল মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষী, মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষী- বুখারী।

মিথ্যা কসম: সাধারণত কসম করা হয় কাউকে কোন কথা বিশ্বাস করানোর জন্য। নিজের কথার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। প্রমাণ বিহীন কথার প্রমাণস্বরূপ পেশ করার জন্য। আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোরভাবে মিথ্যা কসমের নিন্দা করে বলেন: যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মুল্যে বিক্রয় করে। পরকালে তাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি (আল ইমরান ৭৭)। আল্লাহর রাসূল বলেন, কেউ যদি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মুসলিমের হক কেটে দেয় (মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কারো হক নষ্ট করে) আল্লাহ তারজন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। একথা শুনে এক সাহাবি বললেন যদি সামান্য বস্তুর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে। তখন নবী করীম (সা.) বললেন হ্যাঁ যদি আরাকের (এক প্রকার গাছ) সামান্য একটি ডালও হয়- মুসলিম।

গীবত: যবানের দ্বারা সংগঠিত গুনাহের মাঝে মানুষ অহরহ গীবত করে। হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলে কারীম (সা.) কে প্রশ্ন করা হল গীবত কি? তিনি উত্তরে বলেন গীবত হল এই যে তুমি তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্বন্ধে এমন কিছু আলোচনা করবে যা সে অপছন্দ করে। আবার প্রশ্ন করা হল তার সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হল তা যদি তার মধ্যে বাস্তব থাকে। জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ গীবত তো এটাই। আর যদি বাস্তবে দোষ তার মধ্যে না থাকে ওটাতো অপবাদ- বুখারী। রাসূলে কারীম (সা.) আরও বলেন এক মুসলমান অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানহানি হারাম- মুসলিম। আমরা ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেকেরই গীবত করি। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এই বিষয়ে সতর্ক করে ইরশাদ করেন, হে মুমিনগণ তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কারণ কোন কোন অনুমান গুনাহ। তোমরা কারো গোপন ত্রুটি অনুসন্ধানে করবে না এবং তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভায়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে। তোমরা তা অপছন্দ করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী অসীম দয়ালু- সুরা হুজরাত ১২। রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন গীবত যেনার চেয়ে জঘন্য। আল্লাহর রাসূল বলেন, মীরাজের সময় আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যাদের ছিল তামার নখ। সেই নখ দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা এবং বুক ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি বললাম জিবরীল এরা কারা। উত্তরে তিনি বললেন যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত অর্থাৎ গীবত করত এবং মানুষের সম্মানহানি করত- আবু দাউদ।

পরনিন্দা করা: সমাজ জীবনে ফেতনা ফাসাদ এর অনেক ঘটনা চোগল-খুরী বা পরনিন্দার কারণে হয়। পরনিন্দাকারী অন্যকে লাঞ্ছিত করতে গিয়ে নিজে লাঞ্ছিত হয়। আল্লাহ তায়ালা এই ধরনের স্বভাবের নিন্দা করে বলেন, দুর্ভোগ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির যে পেছনে ও সামনে মানুষের নিন্দা করে- হুমাযাহ ১। আল্লাহর রাসূল বলেন পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা- মুসলিম।

দ্বিমুখীপনা /চোগলখুরী করা : হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন দ্বিমুখী চরিত্রের লোকেরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে- বুখারী। অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, একবার রাসূলে কারীম (সা.) দুটি নতুন কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে গেলেন। দুআ করলেন। খেজুরের ডাল দুই টুকরা করে দুটি কবরে গেঁড়ে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম কিছুই বুঝতে পারলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাসূলে কারীম (সা.) বললেন কবর দুটিতে এমন কোন গুনাহের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে না যা থেকে বেঁচে থাকা তাদের জন্য কঠিন ছিল। সহজেই তারা বাঁচতে পারতো। কিন্তু বেঁচে থাকেনি। একজন পেশাবের ফোটা থেকে বেঁচে থাকেনি। অপরজন চোগলখুরি করে বেড়াতো । আল্লাহ তায়ালা দুজনকে

শাস্তি দিয়েছেন- বুখারী।

দোষ চর্চা: একদিন হযরত আয়েশা নিজের কথা বর্ণনা করেন যে আমি একবার নবী করিম (সা.) এর কাছে সাফিয়্যা সম্পর্কে বললাম সাফিয়্যা তো এই (অর্থাৎ বেঁটে)। এই কথা শুনে নবীজি বললেন তুমি এমন কথা বলেছো যদি তা সাগরের পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সাগরের পানি ঘোলা হয়ে যাবে-সুনানে আবু দাউদ। কারো দোষ বর্ণনার পরিবর্তে তা ঢেকে রাখা নেকীর কাজ। আবু হুরাইরা বলেন রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে বান্দাহ অন্য বান্দার দোষত্রুটি ইহজীবনে গোপন রাখবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন- মুসলিম।

তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও মন্দ নামে ডাকা: হাসি তামসার স্থলে বা ইচ্ছা করে কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা বা মন্দ নামে ডাকতে দেখা যায়। কিন্তু এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ কোন পুরুষ যেনো অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে কেননা যাকে উপহাস করা হচ্ছে সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে'। কোন নারী অপর কোন নারীকে যেনো উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা এসব থেকে বিরত না হবে তারা যালেম- সুরা হুজরাত ১১। মাওলানা তাকী উসমানী তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনে উল্লেখ করেন যে, কাউকে খারাপ নাম দিয়ে দিলে তা তার জন্য পীড়াদায়ক হয়। কাউকে অপমান করা বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা মুমীনের স্বভাব হতে পারে না। রাসূলে কারীম (সা.) বলেন , তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। একে অপরের প্রতি যুলম করো না এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করো না- মুসলিম।

বিতর্ক পরিহার করা: হযরত আবু উমামা বাহেলী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি ঘরের দায়িত্বগ্রহণ করব যে সত্য ও সঠিক হবার পরও বিতর্ক ছেড়ে দেয়। আর ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে কোন গৃহের জামিন হব যে ঠাট্টাস্থলেও মিথ্যা পরিহার করে। আর যে ব্যক্তির চরিত্র সুন্দর হবে তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চস্থানে একটি ঘরের দায়িত্ব গ্রহণ করব- আবু দাউদ।

হাসি তামশা ও ঠাট্টা করা: কাউকে নিয়ে হাসি তামশা করা শোভনীয় নয়। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা বলেন সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে কারীম (সা.)কে একবার বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনিও আমাদের সাথে হাসি তামশা করেন। তখন নবীজি বলেন হ্যাঁ আমি হাসি তামশা করি তবে আমি সত্য ছাড়া বলি না- তিরমিযী। এই হাদীস থেকে বুঝা যায় সত্য কথা শরীয়তের সীমার মাঝে আনন্দদায়কভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। তবে এটা মাঝে মধ্যে করা যায়। সব সময় হাসি তামাশায় মত্ত থাকা ঠিক নয়।

শোনা কথা বলে বেড়ানো: হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলে কারীম (সা.)কে বলতে শুনেছেন যে কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে যা শুনে তা বলে বেড়ায়- মুসলিম।

ভাল-মন্দ বিচার না করে কথা বলা: আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছেন কোন বান্দা ভাল মন্দ বিচার না করে এমন কথা বলে যার কারণে সে পদস্খলিত হয়ে জাহান্নামের এতদূর গভীরে চলে যায় যা পুর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের দূরত্বের সমান- বুখারী।

কথায় কষ্ট দেওয়া: হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম (সা.) এর সামনে একজন নারী সম্পর্কে বলা হল সে খুব নফল নামায পড়ে রোজা রাখে এবং দান সদকা করে। কিন্তু তার মুখের ভাষা প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ বললেন সে জাহান্নামী। ঐব্যক্তি আরেকজন নারী সম্পর্কে বললেন যার নফল রোজা ও দান সদকার ক্ষেত্রে কোন প্রসিদ্ধি নাই। কখনো হয়ত সামান্য পনিরের টুকরা সদকা করে তবে সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। কেউ তার মুখের ভাষায় কষ্ট পায় না। রাসূলুল্লাহ বললেন সে জান্নাতী- মুসনাদে আহমদ।

অভিশাপ ও বদদোয়া: হযরত সামুরা ইবনে জুন্দব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল বলেছেন তোমরা একে অপরকে আল্লাহর অভিস্পাত, তাঁর গজব ও জাহান্নামের বদদোয়া করো না- মুসনাদে আহমদ।

গোপন কথা ফাঁস করা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা: কারো গোপন কথা ফাঁস করা বড় ধরনের অপরাধ। অথ-সম্পর্দ যেমনিভাবে আমানত অনুরূপভাবে গোপন কথা বার্তাও আমানত। আমরা অনেক সময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই যে গোপন কথা ফাঁস করব না কিন্তু কারো সাথে ঝগড়া হলে অথবা মুখ ফসকে অহরহ গোপন কথা ফাঁস করতে দেখা যায়। আবার বলা হয় এটা অত্যন্ত গোপন। শুধু আপনাকেই বলছি। আপনি আর কাউকে বলবেন না।

অহেতুক তোষামোদী করে প্রশংসা করা: একজন মানুষ আরেকজনকে কৃতজ্ঞতা জানানো ইসলামের শিক্ষা। কিন্তু তোষামোদী করে প্রশংসা করবে না। রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন যখন কোন ফাসেকের প্রশংসা করা হয়। তবে কারো গুণাবলী তুলে ধরা তোষামোদী নয়। যেমন রাসূলে কারীম (সা.) আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, মায়ায ইবন জাবালসহ অনেক সাহাবার গুণাবলী তুলে ধরে প্রশংসা করেছেন।

তাকাল্লুফী না করা: অনেক সময় দেখা যায় কারো ক্ষুধা আছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আপনার কি ক্ষুধা আছে? আপনি কিছু খাবেন? তখন পেটে ক্ষুধা রেখেও বলা হয় না ক্ষুধা নেই। এই ধরনের তাকাল্লুফী ঠিক নয়। আসল অবস্থা বর্ণনা করা উচিত।

যবানের হেফাজতে কতিপয় করণীয়

বাকসংযম করা ও কথা বলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা: হযরত বেলাল বিন হারেস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এমন কথা বলে যার কল্যাণের কথা সে ধারণাই করতে পারে না অথচ কিয়ামত পর্যন্ত তার দরুন তার সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করে দেন। আবার মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমনও কথা বলে যার অকল্যাণের কথা সে ধারণাই করতে পারে না। অথচ তার দরুন কিয়ামত পর্যন্ত তার অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করে দেন- মুয়াত্তা মালেক।

মিষ্টভাষী হওয়াঃ হযরত আলী রাসূলে কারীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রাসূল বলেছেন নিশ্চয়ই জান্নাতে বলাখানা থাকবে যার ভিতরের সব কিছু বাহির থেকে দেখা যাবে। একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল ঐ বালাখানা কাদের জন্য হবে? আল্লাহর রাসূল জবাবে বললেন যারা মিষ্টভাষী হবে; অভাবীদের আহার দেবে ও রাতের গভীরে নামাায পড়বে- তিরমিযী। আমাদের সকলের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে হবে। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, ছেলে-সন্তান, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, পরিচিত অপরিচিত, নেতা-কর্মী, শাসক-শাসিত সকলেই পরস্পরের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলে আমরা সদকার সাওয়াব অর্জন করতে পারি। আবু হুরাইরা বলেন নবী করীম (সা.) বলেছেন, মানুষের প্রত্যেক সংযোগস্থলের উপর প্রত্যেক দিন সদকা ওয়াজিব হয়। তবে দুজনের মধ্যে ইনসাফ করা দরকার। কোন ব্যক্তিকে তার সওয়ারীর উপর উঠিয়ে দেওয়া কিংবা তার মালপত্র তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করা সদকা। ভাল কথা বলা সদকা। নামাযের জন্য যত কদম চলবে প্রত্যেক কদমে সদকা। আর রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও সদকা- বুখারী।

সর্বদা সত্য কথা বলাঃ আল্লাহর রাসূল বলেন, সদা সত্য বল। কেননা সত্য ভাল কাজের পথে পরিচালিত করে। আর ভাল কাজ জান্নাতে নিয়ে যায়। ব্যক্তি সত্য বলতে থাকে এবং সত্যবাদীতার চেষ্টায় থাকে একপর্যায়ে আল্লাহর খাতায় সিদ্দীক (চির সত্যবাদী) নামে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়- মুসলিম।

জিহবাকে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত রাখাঃ এক সাহাবা রাসূলে কারীম (সা.) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন ইসলামের বিধানতো অনেক আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা আমি গুরুত্বের সাথে পালন করব। আল্লাহর রাসূল বললেন তোমার যবান যেনো সদা আল্লাহর যিকির দ্বারা সতেজ থাকে- তিরমিযী।

ভাল কথা বলা অথবা চুপ থাকাঃ হযরত আবু হুরায়রা বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে- বুখারী ও মুসলিম। চুপ থাকাতে অনেক ফজিলত রয়েছে। চুপ থাকলে মেজাজ সংযত থাকে; অন্তরেও আল্লাহর ভয়-ভীতি থাকে; যিকির ও ইবাদতের জন্য সময় মিলে। আর বেশী কথা বলার মাঝে নানা রকম বিপদ রয়েছে: কথা বেশী বলার কারণে ভুল বেশি হয়। মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, পরনিন্দা, রিয়া, কপটতা, নির্লজ্জতা, কথা-কাটাকাটি, বাড়িয়ে কথা বলা, অপরকে কষ্ট দেওয়া, অন্যের গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার অপরাধ সংগঠিত হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুটো কান আর একটি মুখ দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে আমরা বেশি শুনতে হবে। আর বলতে হবে কম। অনেক মানুষ সব সময় বেশী কথা বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু প্রয়োজনের আলোকে কথা বলা দোষণীয় নয়। আমাদেরকে তিন অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় জিহ্বাকে রাখতে হবে: ১. সত কাজের আদেশ বা অসত কাজের নিষেধ ২. আল্লাহর যিকির ৩. চুপ থাকা

কথা বলার ক্ষেত্রে নম্রতা বজায় রাখাঃ জিহ্বা একটি নরম গোশতের টুকরা । কথা বলার সময় নম্রভাবে বলা উচিত। হযরত আয়েশা বলেন একবার একদল ইয়াহুদী আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বলল আসসামু আলাইকুম অর্থাৎ তোমার মরণ হোক। আয়েশা বললেন তোমাদের উপর আল্লাহর লানত ও গযব পড়ুক। তখন নবী করীম (সা.) বললেন হে আয়েশা একটু থাম। নম্রতা অবলম্বন করা তোমাদের কর্তব্য। রুঢ়তা ও অশালীনতা বর্জন কর। আয়েশা কললেন তারা যা বলেছে আপনি কি তা শোনেননি। তিনি বললেন আমি যা বললাম তুমি কি তা শোননি। কথাটি তাদের উপরই ফিরিয়ে দিয়েছি। সুতরাং তাদের ব্যাপারে আমর কথা কবুল হবে। আর আমার সম্পর্কে তাদের কথা কবুল হবেনা- বুখারী।

সান্ত্বনার বাণী শোনানোঃ আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে নানা সমস্যায় জর্জরিত। যেমন বর্তমানে কোভিড ১৯ এই বৈশ্বিক মহামারী চলছে। অনেক মানুষ অসহায় অবস্থায় রয়েছে। তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা দরকার। শুধু হতাশা নয় মানুষের মাঝে সান্ত্বনার বাণী ছড়িয়ে দেওয়া নেকীর কাজ। রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন যদি কোন ব্যক্তি এমন নারীকে সান্ত্বনার বাক্য বলে যার ছেলে নিখোঁজ হয়ে গেছে বা মারা গেছে তাহলে আল্লাহ তায়ালা ঐ সান্ত্বনাদানকারীকে জান্নাতে মূল্যবান জামাজোড়া পরিধান করাবেন। কোন ব্যক্তি পথ চিনছে না আমরা যদি তাকে পথ দেখাতে সাহায্য করি এটাও নেকীর কাজ। কোন ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের মাঝে থাকলে তাকে সান্ত্বনা দিলে বা তার পেরেশানী দূর করার জন্য পরামর্শ দিলে সাওয়াব মিলে।

জিহ্বা দ্বারা দ্বীনি শিক্ষা দেওয়াঃ জবান দ্বারা কাউকে যদি দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে অনেক নেকী অর্জন হবে। যেমন কেউ কুরআন পড়তে পারেনা। তাকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া। কেউ ভুলভাবে নামায পড়ে। তাকে নামাযের সঠিক নিয়ম শিক্ষা দেওয়া । জিহ্বার সামান্য নড়াচড়ায় যদি কারো নামাজ সহীহ হয়ে যায় এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে?

আল্লাহ অসন্তুষ্ট এমন কথা না বলাঃ হযরত আবু হুরাইরা বলেন রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন, যদি তোমার কোন বিপদ আসে তাহলে এরুপ বলোনা যদি আমি এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হত। বরং তুমি বল আল্লাহই তাকদীরে রেখেছেন। আর তিনি যা চান তা করেন। কারণ যদি শব্দটি শয়তানের কাজ চালু করে দেওয়া- মুসলিম।

বৈরী পরিবেশেও ইনসাফের কথা বলাঃ আবু সাঈদ খুদরী বলেন আল্লাহর রাসূল বলেছেন স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলা উত্তম জিহাদ- তিরমিযী।

অধীনস্থ বা চাকরের সাথে ব্যবহারঃ আনাস বলেন কোন পশমী ও রেশমী কাপড়কেও আমি রাসূলে কারীম (সা.) এর হাতের তালুর চেয়ে অধিকতর নরম ও মোলায়েম মনে করি না। কোন সুগন্ধিকেও আমি রাসূলে কারীম (সা.) এর শরীরের সুগন্ধির চেয়ে অধিকতর সুগন্ধি পাইনি। আমি দীর্ঘ দশ বছর তাঁর খেদমতে ছিলাম। কিন্তু কখনও তিনি আমার প্রতি উহ শব্দ উচ্চারণ করেননি। আমার কৃত কোন কাজের জন্য বলেননি যে, কেন তুমি এটা করলে? আর কোন কাজ না করার জন্য বলেন নি কেন তুমি করলেনা?-বুখারী।

সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দেওয়া মুস্তাহাবঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের যারা মনযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা ভাল তা গ্রহণ করে-সুরা যুমার ১৭-১৮। কেউ কোন ভাল কাজ করলে তার জন্য তাকে মুবারকবাদ দেওয়া বা কাউকে কোন সুসংবাদ পৌঁছানো মুস্তাহাব।

প্রতিশ্রুতি পূরণ করা এবং নতুন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে চিন্তা করা

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে দুআ করাঃ হযরত আয়েশা বলেন নবী করিম (সা.) নিজের পরিবারের কোন রোগীকে দেখতে গেলে তার উপর ডান হাত বুলিয়ে বলতেন হে আল্লাহ মানুষের প্রভু। রোগ দূরকারী রোগমুক্তি দান কর। তুমিই রোগমুক্তি দানকারী। তোমার রোগমুক্তি ছাড়া কোন রোগমুক্তি কার্যকর নয় যা কোন রোগকে ছাড়ে- বুখারী। সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস বলেন যখন আমি অসুস্থ ছিলাম তখন আল্লাহর রাসূল আমাকে দেখতে আসলেন এবং বললেন হে আল্লাহ সাদকে রোগ মুক্তি দান কর। হে আল্লাহ সাদকে রোগমুক্তি দান কর। হে আল্লাহ সাদকে রোগমুক্তি দান কর- মুসলিম।

কথা বলা প্রসঙ্গে আলকুরআনে বর্ণিত কতিপয় পরিভাষা ও গাইডলাইন

১.সঠিক কথা বলা (ক্বাওলান সাদীদা- Speak Truthfully-Speak with Justice): আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সঠিক কথা বলতে নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল । তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যক্রম সমূহ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসফলতা লাভ করবে- আহযাব ৭০-৭১। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের গুণাবলী এইভাবে বর্ণণা করেন , ' তারা ধৈর্য্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী , সৎপথে ব্যয়কারী ও শেষরাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আলইমরান ১৭।

২. শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলা (ক্বাওলান কারীমা- Speak graciously): আল্লাহ বলেন তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করোনা এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদের উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদেরকে শিষ্টাচারপুর্ণ কথা বল- বনী ইসরাঈল ২৩।

৩.সহজভাবে কথা বলা (ক্বাওলান মায়সুরা- Speak Gently) : আল্লাহ বলেন তোমার পালনকর্তার করুনার প্রত্যাশায় অপেক্ষমান থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয় তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল- বনী ইসরাঈল ২৮।

৪.নম্রভাবে কথা বলা (ক্বাওলান লায়্যিনা- Speak Softly): আল্লাহ বলেন তোমরা উভয়েই ফেরাউনের কাছে যাও সে উদ্ধত হয়েছে। অতপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল। হয়ত সে চিন্তা ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে- ত্বাহা ৪৩-৪৪।

৫.শরীয়ত সম্মত কথা বলা (ক্বাওলান মারুফা- Speak effectively) : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন হে নবী পত্নীগণ তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। ফলে সে ব্যক্তি কুবাসনা করে যার অন্তরে ব্যধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথা বার্তা বলবে (আহযাব ৩৩)। আর যদি তোমরা আকার ইঙ্গিতে সেই নারীর বিবাহের পয়গাম দাও কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ তবে তাতেও তোমাদের কোন দোষ নাই আল্লাহ জানেন যে তোমরা অবশ্যই সেই নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরীয়ত নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নিবে (বাকারা ২৩৫)। 'আর যে সম্পদ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবন যাত্রার অবলম্বন করেছেন তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিওনা। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও পরাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনা বাণী শোনাও (নিসা ৫)। অন্যত্র বলেন, এবং সম্পত্তি বণ্টনের সময় আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয় তখন তা থেকে তাদের কিছুই খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ কর (নিসা ৮)।

৬.উপদেশপুর্ণ কল্যাণকর কথা বলা (ক্বাওলান বালীগা- Speak Deeply): ' এরা হল সেই সমস্ত লোক যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ তায়ালা অবগত। অতএব আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর- নিসা ৬৩।

৭.সৎ ও ইতিবাচক কথা বলা (কুলু লিননাসি হুসনা- Speak Positively): আল্লাহ ইরশাদ করেন, ' যখন আমি বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপসনা করবে না, পিতা মাতা আত্মীয়স্বজন, এতীম ও দ্বীনদরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সত কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী- বাকারা ৮৩।

৮.উত্তম কথা বলা (Speak Beautifully): আমার বান্দাদেরকে বলে দিন তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু- বনী ইসরাঈল ৫৩।

৯.স্পষ্টভাবে কথা বলা (Speak clearly): আল্লাহ তায়ালা মুসার দুআর কথা এইভাবে উল্লেখ করেন, ' মুসা বললেন হে আমার পালনকর্তা আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে- তাহা ২৫-২৮।

১০.মিথ্যা না বলা (Speak without a Lie): অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ ও জ্বিন কখনও আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারেনা- জ্বিন ৫।

১১.গুরুতর কথা (ক্বাওলান আযীমা): তোমাদের পালনকর্তা কি

তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা গুরুতর গর্হিত কথা বলছ- বনী ইসরাঈল ৪০।

১২.গুরুত্বপূর্ণ বাণী (ক্বাওলান সাক্বীলা): আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী- মুযযাম্মিল ৫। এই আয়াতে ভারী কালাম বলে কুরআন বুঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন বর্ণিত হালাল হারাম , জায়েয-নাজায়েয এর সীমা স্থায়ীভাবে মেনে চলা স্বাভাবিকভাবে ভারী ও কঠিন। তবে যার জন্য আল্লাহ তায়ালা সহজ করে দেন তার কথা স্বতন্ত্র। কুরআনকে ভারী বলার আরেক কারণ এই যে, কুরআন নাযিল হওয়ার সময় রাসূলে কারীম (সা.) বিশেষ ওজন অনুভব করতেন ফলে প্রচণ্ড শীতেও তাঁর মস্তক ঘর্মাক্ত হয়ে যেতো। তিনি তখন কোন উটের উপর সওয়ার থাকলে বোঝার কারণে উট নুয়ে পড়ত- বুখারী।

কুরআনে কথা বলার কতিপয় নির্দেশনা

- কথাবার্তায় কর্কশ হবেন না- ০৩: ১৫৯
- লোকদের সাথে ধীরস্থিরভাবে শান্তভাবে কথা বলুন- ২০:৪৪
- উচ্চস্বরে কথা বলবেন না ৩১:১৯
- অন্যকে উপহাস করবেন না- ৪৯:১১
- পিতা-মাতার প্রতি সম্মানজনক কথা বলূন-১৭:২৩
- সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করবেন না- ২:৪২
- কাউকে খোঁটা দিয়ে কথা বলবেন না-২:২৬৪
- কাউকে গালাগাল করবেন না-২:৬০
- বিভক্তি উসকে দিবেন না- ৩:১০৩
- প্রতারণার পক্ষে ওকালতি করবেন না- ৪:১০৫
- অন্য ধর্মের দেব-দেবীর প্রতি অবমাননা করবেন না- ৬:১০৮
- মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করুন হিকমা ও উত্তম ভাবে- ১৬:১২৫
- কথা বলার সময় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা (Speak Moderately) বলুন আল্লাহ বলে আহবান কর বা রহমান বলে যে নামেই আহবান কর না কেন সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায পালনকালে স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন- বনী ইসরাঈল ১১০।

জিহবা ও ভাষা সংরক্ষণে কতিপয় পরামর্শ

- আমরা যা বলি তা' আমল লেখক সন্মানিত ফেরেশতাগণ' রেকর্ড করেন (ইনফিতার ১০-১১) এই কথা সদা চিন্তা করতে হবে। হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ বলেন ফেরেশতাগণ মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন কেবল সেই সব বাক্য লিখিত হয় যেগুলো সাওয়াব বা শাস্তিযোগ্য।
- কথা বলার আগে ভাবা । যখন কোন কথা বলার প্রয়োজন হবে তখন চিন্তা করতে হবে এই কথাতে দ্বীনের কোন উপকার ও কল্যাণ আশা করা যায় কিনা? এই কথাতে জাগতিক কোন ফায়দা আছে কিনা
- কথা বলার আগে ভাবা তারপর বলা। কারণ নাভেবে কথা বলার কারণে অনেক সময় লজ্জিত হতে হয়। অনেক সময় পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয়।
- কোন মেসেজ দেওয়ার আগে চেক করা ড্রাফট করে কিছু সময় পর তা চেক করা এবং তারপর পাঠানো।
- কারো সাথে কোন কথা বা আচরণে কষ্ট দিলে বা অশোভনীয় কথা বললে সাথে সাথেই ক্ষমা চাওয়া
- পরিবেশ বিবেচনায় রেখে কথা বলা । ভাল সঙ্গী বাছাই করা যাতে খারাপ আলোচনা না হয়
- প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা; নীরব থাকা । মন্দ কথার জবাব উত্তম ভাষায় দেওয়া
- আমরা জীবনের অনেক বছর পার করেছি। অতীতে হয়ত জবানের হেফাজত সঠিকভাবে করতে পারি নাই। আজ থেকে জবানের হেফাজত করব এই ধরনের দৃঢ়সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- মিথ্যা প্রপাগান্ডা না ছড়ানো। বিশেষভাবে ফেসবুকে বা পত্রিকায় কিছু দেখেই অনেকে যাছাই বাছাই না করা তা অন্যকে বলা শুরু করে দেন।

  তরবারীর আঘাতে শুকিয়ে যায় কিন্তু জিহবার আঘাতসহজে শুকায়না

  তরবারীর আঘাতে কারো শরীরে ক্ষত হলে তা শুকিয়ে যায়। কিন্তু জিহ্বা আঘাতের ক্ষত সহজে শুকায় না। কারণ তরবারীর আঘাত লাগে দেহে আর জিহ্বার আঘাত লাগে কলিজায়। তাই এমনভাবে কোন কথা বলা উচিত নয় যা কারো হৃদয়ে আঘাত করে। কবি বলেন, বর্শার যখম শুকিয়ে যায় কিন্তু যবানের যখম শুকায়না। অতএব আমাদেরকে ভাবা দরকার আমি আমার মুখের ভাষা দ্বারা কাউকে কষ্ট দিয়েছি কিনা। যদি তা করে থাকি তার কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন। আর অনুমান নির্ভর কোন কথা না বলে তথ্য যাছাই বাছাই করে কথা বলা বা তথ্য দেওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে অনুমান করে কথা বলোনা। কেননা কর্ণ চক্ষু হৃদয় ওদের প্রত্যেকের বিষয় কৈফিয়ত তলব করা হবে- বনী ইসরাঈল ৩৬।

অতএব যবানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল গুনাহ থেকে আমাদের সকলকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে। কারো নাম ব্যঙ্গ করা, বিদ্রুপ করা,অশ্লীল কথা বলা, গালি দেওয়া, পরনিন্দা করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, চোগলখুরী করা, বিনাপ্রয়োজনে গোপনীয়তা ফাঁস করা, মুনাফেকী করা, হারাম বা নাজায়েজ জিনিস নিয়ে আলোচনা করে আনন্দ পাওয়া, গীবত করা, খারাপ উপনামে ডাকা, অভিশাপ দেওয়া, অযথা চিতকার করে চেঁচামেচি করা, বেহুদা কথা বলা, মিথ্যা কথা বলা, অশ্লীল গান গাওয়া, কারো মুখোমখি প্রশংসা করা, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কথা না বলা, কেউ মারা গেলে উচ্চ স্বরে বিলাপ করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।

যবান বা জিহবা যেসব কারণে নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয় না তা চিহ্নিত করতে

হবে। যেমন আমরা অধিক রাগের কারণে অনেক সময় মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি না। আবু হুরাইরা বলেন রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয় লাভ করাতে বীরত্ব নেই বরং ক্রোধ ও রাগের মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের লক্ষণ । জনৈক সাহাবা রাসূলে কারীম (সা.) কে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাকে অসীয়ত করুন। আল্লাহর রাসূল বলেন লাতাগযাব-তুমি রাগ করো না। এই কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেন। রাগ নিয়ন্ত্রণ করা মুমীনের বৈশিষ্ট্য আলইমরান ১৩৪। রাসূলে কারীম (সা.) বলেন যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণ করে অথচ সে তা বহিপ্রকাশ করতে সক্ষম। তাকে আল্লাহ তায়ালা যে কোন হুর নির্বাচন করার ইখতিয়ার দিবেন।

কারো অপরাধ ক্ষমা করা মহত্বের লক্ষণ। কারো দুখ কষ্ট বা অন্যায় ক্ষমা করে দিলে তার সাথে খারাপ কথা বলার প্রশ্নই উঠেনা। একজন মুমীন আরেকজন মুমীনকে হৃদয় থেকে ক্ষমা করে দেয়- আল-ইমরান ১৩৪। হযরত উকবা ইবন আমের বলেন রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন হে উকবা আমি কি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতবাসীর সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য বলব। (আর তা হল) যে তোমার সাথে সম্পর্কছেদ করবে তুমি সম্পর্ক গড়বে; যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তুমি তাকে দান করবে; আর যে তোমার প্রতি যুলম করেছে তুমি তাকে ক্ষমা করবে। আল্লাহ তায়ালা অন্যকে তার ভুলের জন্য ক্ষমা করতে বলেছেন- ৭:১৯৯। আবু হুরাইরা বলেন রাসূলে কারীম (সা.) এর কাছে জনৈক ব্যক্তি বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমার কিছু আত্মীয় স্বজন আছে আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করি কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালোব্যবহ-ার করি কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ আচরণ করে। আমি তাদের বেলায় সহ্য করি কিন্তু তারা আমার সাথে কুআচরণ করে। তখন তিনি বললেন যদি তুমি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই প্রবেশ করাচ্ছ। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা তোমার সাহায্যে রত থাকবে যতক্ষণ তুমি সে অবস্থার উপর থাকবে- মুসলিম।

প্রতিনিয়ত মুহাসাবা করা। আত্মপর্যালোচনা ও আত্মপর্যবেক্ষণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন? -হাদীদ ৪। আল্লাহ তায়ালা চোখের ঘাতকতা ও মনের গোপন কথা জানেন-গাফের ১৯। আমাদের সকল কথা রেকর্ড হচ্ছে। অতএব আমাদেরকে প্রতিনিয়ত আত্মপর্যালোচনা করা প্রয়োজন আমরা আমাদের মুখের ভাষা ও জিহ্বা দিয়ে কাউকে কষ্ট দিয়েছি কিনা? কারো প্রতি কটু কথা বলেছি কিনা? মূলত এইভাবে মাহে রমযানের সিয়াম সাধনা শুধু পনাহার ও যৌনসঙ্গম থেকে বিরত থাকা সোবহে সাদেক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকার নাম নয়। বরং দেহের রোজার সাথে সাথে চোখ, পেট ও জিহবার সিয়াম সাধনা যথাযথ করলেই প্রকৃত রোজা পালন হবে। মাগফিরাত, রহমত ও নাজাতের মাসে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রোজা রেখেই আমাদেরকে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করতে হয় আর দোজখের দরজা বন্ধ রাখতে হয়। প্রতি বছর মাহে রমযানের এই ট্রেনিং সারা বছর জাগরুক রাখতে পারলেই আমাদের দুনিয়ার জীবন শান্তিময় হবে আর আখিরাতে মিলবে নাজাত।

জিহবা বা ভাষা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজস্ব কোন পন্থা অবলম্বন করা: হযরত আবু বকর একদিন স্বীয় জিহবা ধরে বসেছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন আপনি এমনটি করছেন কেন? তিনি জবাব দেন যে এই যবান আমাকে ধ্বংসের দিকে নিপতিত করছে এইজন্য আমি এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়াস চালাচ্ছি। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন তাঁর কসম যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। জিহবা ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে আর কোন বস্তু নাই যাকে দীর্ঘসময় কারারুদ্ধ করে রাখা প্রয়োজন। ইবনে উমর বলেন মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে সংশোধনের অঙ্গ হল তার জিহ্বা। ইমাম শাফেয়ী বলেন হে রাবী অনর্থক কথা বলো না। কেননা তোমার বলে ফেলা কথার জন্য একদিন তোমাকে পাকড়াও করা হবে। উমর ইবন আব্দুল আজিজ বলেন হৃদয় হল রহস্যের সিন্ধুক ওষ্ঠাধর হল তার তালা আর জিহবা হল তার চাবি।

লেখক: বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক
ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলের সদস্য, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন

ইউরোপে রামাদ্বান স্মৃতি

রামাদ্বানঃ আসমানি বরকতের চাবি

মাওলানা আব্দুস সাত্তার, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া,৮ মার্চ ২০২২

রামাদ্বান মাস আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার এক বিশেষ নিয়ামত। আসমানি বরকতের চাবি। সাওয়াব অর্জনের মৌসুম। এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল কুরআন। রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের মাসও হলো এ রামাদ্বান।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ

وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَ الْفُرْقَانِۚ

রামাদ্বান মাস, এ মাসেই কুরআন নাজিল করা হয়েছে, মানুষের জন্য হিদায়াত ও পথ প্রদর্শক এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে।(বাক্বারাহ: ১৮৫)

এ মাসের ফজিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-

‘‘বরকতময় রামাদ্বান মাস তোমাদের দুয়ারে হাজির হয়েছে। পুরো মাস রোজা পালন আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরজ করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়। এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে মহাকল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো।’’ সুনানে আততিরমিযী -৬৮৩

এ মাসে ঈমান ও ইখলাসের সাথে ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দেখানো পদ্ধতিতে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর রেজাবন্দি হাসিল করার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে।

এই সওগাত নিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আমাদের সামনে রামাদ্বান সমাগত। রামাদ্বানকে সামনে রেখে মুমিন মনে বইছে খুশীর ঢেউ। আমরাও আল্লাহর কাছে রাসূল (সা:) এর শিখানো ভাষায় দোয়া করছি-

আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজাবা ওয়া শাবান, ওয়া বাল্লিগনা রামাদ্বান।

যেহেতু আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ইউরোপে রামাদ্বান নিয়ে স্মৃতিচারণ, সেহেতু এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

আল্লাহর এই অফুরন্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কেবল রামাদ্বানের রোজা রাখার মাধ্যমেই করা যায়। সেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ থেকেই পারিবারিক পরিবেশে রামাদ্বানের রোজা রেখে আমরা অভ্যস্থ। কিন্তু জীবনের একটি পর্যায়ে এসে আল্লাহর ইশারায় আমরা নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে প্রবাসে এসে রামাদ্বানের রোজা রাখার অভিজ্ঞতা সম্ভবত সবার ক্ষেত্রেই একটু ব্যতিক্রম। আমার ক্ষেত্রেও তাই। যে বছর প্রথম অস্ট্রিয়ায় আসলাম ঠিক এর কয়েকমাস পরেই ছিল রামাদ্বান মাস। সে বছরই প্রথম অনুভব করলাম, রমাদানে প্রবাসে দেশের মতো সেহরি ও ইফতারে এতো হই হুল্লোড় নেই, নেই রাখ ডাক। নেই প্রতি দিনকার ইফতার মাহফিল আয়োজনের ব্যস্ততা। ছোট পরিসরে কয়েকজন মিলে সেহরি ও ইফতার, সেইসাথে

প্রিয়জনের শূন্যতা ও হাহাকার। তবুও দিন যায় রাত যায়, এভাবে মাস চলে যায়। সময়ের গতিতে চলে যায় রামাদ্বান।

তবে সুখস্মৃতি হলো- দেশে শত ব্যস্ততার মাঝে কিছুটা হলেও ইবাদতে বিঘ্ন ঘটেছে, যা প্রবাসে হয়নি। অনেকটা প্রশান্তচিত্তে দীর্ঘ সময় ও পরিবেশের আলোকে ইবাদতে মশগুল হওয়ার সুযোগ হয়েছে।

মুক্তির সওগাত নিয়ে আসা কাঙ্ক্ষিত সেই রামাদ্বান মুমিন জীবনের পরিশুদ্ধি এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস হোক, আজকের এই দিনে এই হোক অঙ্গীকার।

ইউরোপে আমার রামাদ্বানের স্মৃতিময় অভিজ্ঞতা

গোলাম মাওলা, জুরিখ, সুইজারল্যান্ড

১৯৯০ ইং সাল, ইউরোপে আমার প্রথম রামাদ্বান। দেশে রেখে আসা মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সবচেয়ে বেশী মিস করেছি এ রামাদ্বান মাসে। তখন যে শহরে থাকতাম সেখানে আমার এলাকার পূর্ব পরিচিত কেউ ছিল না। এজন্য মনটা খারাপ লাগত। যারা একসাথে দেশ থেকে এসেছিলাম তাদের মধ্যে ক্লাসফ্রেন্ড নাসির অন্য শহরে চলে যান। মাসজিদ না চেনায় বাসায় একাকী সালাত আদায় করতাম। রুমমেটদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন গুলজার হোসাইন ভাই। আমি রান্না করতে পারতাম না। অধিকাংশ সময় তিনিই রান্না করতেন এবং আমাদের নিয়ে কাজের ফাঁকে কেনাকাটা ও ঘুরতে যেতেন। তিনি এখন লন্ডনে থাকেন। ময়মনসিংহের জাকির ভাই নিয়মিত নামাজ পড়তেন। রোজার মাসে তার সাথে প্রথম একদিন পাকিস্তানী মাসজিদে জুম'আ পড়তে গেলাম। ইমাম সাহেব রোজার ফজিলত ও নিয়মাবলী আলোচনা করলেন, তবে উর্দু ভাষায় খুৎবাহ্ দেওয়ায় পুরোপুরি বুঝনি। শুনেছি তিনিও এখন লন্ডনে থাকেন। কর্মব্যস্ত থাকায় দেশের মত ইফতার ও সেহরীর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ঈদুল ফিতরের দিন সকালে আমার কর্মস্থলে এসে আমার এক বন্ধু মফিজুল ইসলাম ভাই যিনি একই ফ্লাইটে আমার সাথে এসেছিলেন, দেশের কথা বলতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। নারায়নগঞ্জের নগরখানপুরের মহসিন খান ভাই যিনি আমাকে অনেক সাহায্য করতেন, তার সাথে পরামর্শ করে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে একসাথে ঈদের পার্টির আয়োজন করি। তিনি কোথায় আছেন, জানি না। সম্ভবত তিনিও লন্ডন পাড়ি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে নেক হায়াত দান করুন।

১৯৯২ সালে আমরা কয়েকজন বাংলাদেশী সাউথার্ন সুইজারল্যান্ডের Lugano একসাথে থাকতাম। আমাদের সম্পর্ক ছিল পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনদের মত। জুমাবার ছুটি না থাকায় কখনও জুম'আ রীতিমত আদায় করা সম্ভব হয়নি। তখন আমরা সেহরী, ইফতার ও সালাতের জন্য Geneva Islamic Foundation এর সময়সূচী ব্যবহার করতাম। প্রতিমাসে আমাদের ঠিকানায় সালাতের প্লান পাঠানো হত। ভাগ্যবশত রমাদ্বানে এক জুম'আর দিন সরকারী ছুটি ছিল। Islamic Foundation এর মাধ্যমে আমাদের শহরে যে একটি আরব তিউনিসিয়ান মাসজিদ ছিল তার সন্ধান পেলাম। আমরা তিন বন্ধু ছাগলনাইয়ার জাকির ভাই ও শ্রীনগরের বাবর ভাই একসাথে যথাসময়ে মাসজিদে পৌছলাম।

আজানের সাথে সাথেই খুৎবাহ্ শুরু হলো। শাইখ সাদ রহ: খুৎবাহ্ দিলেন। কুরআন-হাদীসের আলোকে রামাদ্বানের সিয়াম, তারাবীহ্ ও লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করলেন। তার সে খুৎবায় আমাদেরকে সংযম, সবরের নাসিহাহ্ দিলেন। তার বক্তব্য ইতালিয়ান ভাষায় হওয়ায় আমাদের খুব ভাল লাগল। মাসজিদে অন্যান্য মুসল্লীদের সাথে পরিচয় হলো। এর পর নিয়মিত সেখানে ইফতার, তারাবীহ ও লাইলাতুল ক্বদরের বিজোর রাতগুলি তাদের সাথে কাটাতাম। পরবর্তী দুই বছর আমি মাসজিদের কাছে বাসা নেই। আমরা একসাথে ইমামকে নিয়ে দাওয়াতী কাজ করতাম। আমাদের মাঝে মাসজিদ কেন্দ্রিক ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরী হলো। এ সম্পর্ক Zuerich চলে আসার পরও দীর্ঘদিন আরব ভাইদের সাথে অটুট ছিল।

১৯৯৫ সালে জুরিখে একটি রুম নিয়ে প্রথম রামাদ্বান মাসে ইফতার ও তারাবী শুরু হয়। সেখানে পাচঁ ওয়াক্ত সালাত হতো। তবে সালাতুল জুম'আ সবাই আরবি মাসজিদে আদায় করতেন। ঈদের একটি মাহফিলে ইয়াকুব আলী ভাই, হাবিবুর রাহমান ভাই, নজমূল হুদা ভাই ও অন্যান্য ভাইদের সাথে প্রথম পরিচয় হয়। তারা মাসজিদের দায়িত্বে ছিলেন এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। ইতিমধ্যে পরিচয় হয় এড: জাহিদ হোসাইন ভাই, ফুরকান উদ্দিন ভাই ও জাহিদুল হক ভূইয়া ভাইয়ের সাথে। সে সময় পুরো রামাদ্বান জাহিদ ভাইকে নিয়ে বিভিন্ন শহরে ইফতার মাহফিল করতাম। জাহিদ ভাই ও ফুরক্বান ভাই আলোচনা করতেন। ইয়াকুব আলী ভাইয়ের যে দিন ছুটি থাকত তার গাড়ী দিয়ে আমরা মাহফিলে যেতাম। পরবর্তী দুই বছর সেখানে নিয়মিত ইফতার ও তারাবীহ্ হয়েছে। এর পর একসময় ভাড়া ফ্লাট ছেড়ে দিতে হয়।

১৯৯৮/৯৯ সালে পরামর্শভিত্তিক হাবিবুর রাহমান ভাইয়ের বাসায় রামাদ্বান উদযাপন করি। তখন তার পরিবার দেশে থাকতেন। এর পর শুধু হলরুম ভাড়া নিয়ে ও আরবি মাসজিদে রামাদ্বানের প্রোগ্রাম করতাম।

২০০৭ সালে প্রথম আমরা ঈদের জামাআ'ত চালু করি। ২০১১ সালে হলরুম ও ২০১২ সালে তার্কিস মাসজিদ ভাড়া নিয়ে আমরা সারামাস রামাদ্বান উদযাপন করি। রামাদ্বানের শেষ ১০ দিনের বিজোর রাতগুলি তখন সকল ভাই-বোনেরা মাসজিদে একত্রে ইবাদাত করতো।

২০১৩-২০১৬ সালে আরবদের একটি মাসজিদ আমরা পরিচালনা করি। এ কয়টি বছর তাদের সাথে একত্রে রামাদ্বান উদযাপন করি। বিশেষ করে রামাদ্বানের শেষ ১০ রাত্রির ক্বিয়ামুল্লাইল আমাদের জন্য আজীবন শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে ইনশা আল্লাহ্।

পরের কয়েকটি বছর আমরা আলমগীর সওদাগর ভাইয়ের বাসায় রামাদানের শেষ ১০ রাত একত্রে ইবাদাত করতাম। প্রতিরাতে দারসুল কুরআন ও সালাতুত তাহজ্জুদ হতো।

আলহামদুলিল্লাহ্! গতমাস থেকে আমরা বাংলাদেশীদের নিয়ে সালাতুল জুম'আ চালু করেছি। আমরা মাসজিদের জন্য একটি জায়গা খুজছি। আমাদের জন্য সবাই দু'আ করবেন, মহান আল্লাহ্ যেনোন দয়া করে সুইজারল্যান্ডে বাংলাদেশী ভাই-বোনদের জন্য একটি মাসজিদ প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক্ব দান করেন। আমরা যেনো ছেলে- মেয়েদের দ্বীনে হক্বের ওপর রেখে যেতে পারি। আমীন!

ডেনমার্কে প্রথম রোজা

জারিন তাসনিম

২০২০ সালের ডিসেম্বরে ডেনমার্কে আসার পর ২০২১'এর ১২ এপ্রিল বিদেশের মাটিতে প্রথম রোজা পাই। বাংলাদেশে রোজা মানেই একমাস আগে থেকেই সবাই ব্যক্তিগত ভাবে রোজার প্রস্তুতি নেয়, আর ১০/১৫ দিন আগে থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রস্তুতি শুরু হয়। সব জায়গাতে উৎসব উৎসব ভাব থাকে। রোজার সময় কি খাবো, কখন খাবো, নামাজের জন্য, কুরআনের জন্য আলাদা টাইম রাখা, তারাবীহ নামাজ পড়াসহ কত কিছুর প্রস্তুতি। সরকারি বেসরকারি অফিসগুলার টাইম চেঞ্জ করা হয় রোজার সময়কে কেন্দ্র করে। অপরদিকে ডেনমার্কে পুরোপুরি বিপরীত চিত্র। এখানে আমরা মুসলিম মানে সংখ্যালঘিষ্ঠ। রোজা নিয়ে রাষ্ট্রীয় কোন আয়োজন এর প্রশ্নই আসে না। নিজের মত করে রোজা রাখতে হয়। সেহরির সময় মসজিদ এ ডাকাডাকি নেই, মাইকের উচ্চস্বরের আযান শুনে ইফতার করার কোন সুযোগ নেই।

প্রথম রোজার সেহেরি খাওয়ার দিন সকাল থেকে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। রোজা শুরু হওয়ার দিন থেকে চারদিকে আমি একটা রহমতের অনুভূতি যখন থেকে রোজা বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই পাই। এখানেও পাচ্ছিলাম কিন্তু মনের কোনায় কোথায় যেনো একটা বিষণ্নতা ঘিরে রেখেছিলো। বাংলাদেশে সবার সাথে মিলে সেহরির খাওয়ার সেই দৃশ্যটা বারবার চোখের সামনে ভেসে আসছিলো। মন খারাপ করে সেহেরি খেয়ে ১৭/১৮ ঘণ্টা রোজা রাখার একটা মানসিক প্রস্তুতি নিলাম।

সারাদিন কর্মব্যস্ত দিন শেষে অনেক আয়োজন করে ইফতার নিয়ে অপেক্ষা করার সময় ইফতার এর সময় হয়েছে কিনা জানার জন্য বার বার মোবাইলের সাহায্য নিতে হচ্ছিলো। আমার পরিবারে আছে দুই কন্যা ও স্বামী। আমরা চারজন একসাথে যথাসময়ে ইফতার করলাম। আর আমি ইফতার করার সময়টা বাংলাদেশের ইফতারির স্মৃতি মনে করে আবেগে কিছুটা চোখের পানি ফেললাম। দেশে থাকতে ইফতারের জন্য বিকাল থেকে ছোলা, পিয়াজু, বেগুনি, আলুর চপসহ কত কি বানানো হতো। সাথে যোগ হতো বাইরে থেকে কিনে আনা আরও কয়েক পদ। এখানেও অনেক কিছু বানানো হয় ইফতারকে কেন্দ্র করে, কিন্তু দেশে সবার সাথে ইফতার করার যে একটা তৃপ্তি সেটা পাই না। রোজার জন্য আলাদা শিডিউল না থাকার কারণে রোজা রেখে বাইরে কাজ করা সহ ইবাদাতগুলো করা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে যায়।

বাংলাদেশে আত্মীয়-স্বজনকে ইফতারে জন্য দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ থাকলেও এখানে সেটা সম্ভব নয়। এমনকি বাংলাদেশের মত প্রতিবেশীদের সাথে ইফতার আদান-প্রদানেরও কোন সুযোগ নেই। তবুও ডেনমার্কের অলবর্গ শহরে আমরা খুব অল্প সংখ্যক যেসব বাংলাদেশি পরিবার আছি, রোজার সময়টা এই কর্মব্যস্ত দিনের মধ্যেও যেদিন যেদিন আমরা একসাথে সবাই মিলে ইফতার করতে পেরেছি সেদিন একধরনের উৎসব এর আমেজ পেয়েছি।

২০/২১'টা রোজার পর ঈদের দিন যতই ঘনিয়ে আসতে থাকলো ততই মনটা বেদনায় ভরে গেলো। যাকাত-ফিতরার আলাপ-আলোচনা নিয়ে মাতামাতি নেই, ঈদের কাপড় কেনাকাটা করার আগ্রহ নাই। ঈদের বাজার করা অথবা ঈদে কী কী নতুন আইটেম রান্না করা করা যায় সেটা নিয়ে কোন তাগাদা নেই। চাঁদ রাতে মেহেদী দেওয়া, ঈদের জন্য রান্নার প্রস্তুতি নেওয়া কোন কিছুই ছিলো না, শুধু মন খারাপ লেগে কান্না পাচ্ছিলো। তারপরও ঈদ তো ঈদ'ই। ঈদের দিনের জন্য টুকটাক রান্না করে আর দেশে থাকা পরিবারের সাথে কথা বলে সকাল কাটানোর পর আমরা বাংলাদেশী পরিবারগুলো মিলে ওয়ান-ডিশ স্টাইলে পার্টি করার মধ্য দিয়ে বিকাল থেকে খুব ভালো সময় কাটালাম। সবগুলো বাচ্চা একসাথে খেলাধুলা করে নিজের দেশের মত একটা পরিবেশ পেয়ে এই প্রবাস জীবনে সুন্দর একটা ঈদ সবাই মিলে পালন করলাম, আলহামদুলিল্লাহ।

তবে এই ডেনমার্কে এসে প্রথম উপলব্ধি করলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্ম পালন করলে সেটার কত সুবিধা এবং কতগুন বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। আবার সেই সাথে এটাও উপলব্ধি করলাম এখানে যারা রোজা রাখে বা নামাজ পরে অথবা নিজের ধর্ম প্রাক্টিস করে তারা সত্যিকারের ধার্মিক। অর্থাৎ তারা চক্ষুলজ্জা বা সমাজের চাপে কোন কিছু করে না, নিতান্তই ভিতরের তাড়নায় আল্লাহর ভয়ে করে।

আল্লাহর ইচ্ছায় হয়তো এভাবে আরও অনেক রোজা আসবে প্রবাস জীবনে। কিছুটা আনন্দ, কিছুটা বেদনা, প্রিয়জনদের জন্য আফসোস সহ নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ভালো-মন্দ মিলিয়ে কেটে যাবে এক একটি মহিমান্বিত মাহে রমজান।

প্রবাসে প্রথম রামাদ্বান

সুমাইয়া আক্তার মিলি, জুরিখ, সুইজারল্যান্ড

২০১২ সাল জুলাই মাসের ২২ তারিখ, আমি সুইজারল্যান্ডে আসলাম। ঐ দিনই প্রথম রামাদ্বান শুরু। খুবই অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা আমার।

এখানে এসে দেখি কোথাও আজান দেয় না, আমার আশে পাশে কোন মানুষ নাই, কোন ইবাদতের মহড়া নাই, কেমন যেন মনে হল সবকিছু থমকে গেছে, আরো বিশাল ব্যাপার দিন তো আর শেষ হয় না, রাতের কি হল এই দেশে আসতে ভুলে গেল কিনা। কাকে জিজ্ঞেস করবো কেউ তো নেই। এ কেমন আজব দেশ এ কেমন রামাদ্বান বুঝতে পারছি না।

ও আপনাদেও তো বলাই হলো না যে এ আজব দেশে কেন আসলাম, আমার বিয়ে হয়েছে দশ মাস আগে। আমার অর্ধাঙ্গ আদেশ করেছেন আমাকে এখন আমার বাংলাদেশ, আমার পরিবার, আমার পড়া, আপনজন সবকিছু ছেড়ে এ আজব দেশে আসতে হবে, সেজন্য আমার এখানে আসা।

যাই হোক আমার মন এখন তো ভীষণ খারাপ, সবাইকে ছেড়ে এসে কষ্টে আছি। তারপর ইফতার, সেহরী সব একা মেইনটেইন করতে খুব বেগ পেতে হচ্ছিল। রামাদ্বানের যেই আমেজ তা তো পাচ্ছিলাম না এই আজব দেশে।

আজান শুনতে পাই না এই আফসোস কমাতে আমার ফোন এ অ্যাপ নামিয়ে দিলেন আমার ব্যস্ত স্বামী আলহামদুল্লিাহ। এখন নামাজের সময়টায় মিনিমাম আজান শুনতে পাই, ইফতারের সময়টা বুঝতে পারি একটু স্বস্তির নিশ্বাস।

তারপরও আমার ভিতরে কেমন যেনো শূন্যতা, এত বড় দিন, সময়ের মনে হয় আমার মতই ইমোশনাল অ্যাটাক হয়েছে, শেষই হয় না, আর ইফতারের পর আর দম ফেলার সময় নেই। কি এক অবস্থা।

সপ্তাহের এক বা দুই দিন আমার সাথে কেউ ইফতার করত, না হয় আমি একা একা অপেক্ষা করতাম, আর এই একাকীত্ব আমাকে মনে করিয়ে দিত পরিবার কি জিনিস, আর খুব স্মরণ করাত কবরের কথা। সেখানে তো আমি আরো একা। এভাবে আমি নিজেই নিজের অজান্তেই আল্লাহর সাথে কথা বলা শুরু করলাম। পড়ে খুব অবাক লাগছে তাই না ? এই একাকীত্ব আমাকে রব কে চিনতে সাহায্য করেছে। সবসময় সব মানুষের ভিড়ে কখনোই আমার রবের সাথে এভাবে আমি কথা বলিনি। আমি সব ছেড়ে এসেছি কি হয়েছে, আমার রব তো আমার কাছেই আছেন। আলহামদুল্লিাহ আমি আমাকে গুছিয়ে নিয়েছি।

কিছুদিন পর বাসাটা পরিষ্কার করতে গিয়ে তাফহিমুল কুরআন এর ১৯ নাম্বার খণ্ডটা পেলাম। কীভাবে এলো বইটা এই বাসায় জানিনা, কিন্তু যার মাধ্যমেই এসেছে আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা উনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। আমি কুরআন এর তাফসির পড়ে যে কি আনন্দ পেলাম ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

আলহামদুল্লিাহ আমার রামাদ্বানের পরবর্তী দিনগুলো ভালই কাটল। আমার জীবনের প্রথম জুমার নামাজ মসজিদে পড়তে গেলাম রামাদ্বানের প্রায়। যেটা আমাদের বাংলাদেশে কখনোই সুযোগ হয়নি। এই দিন এক বোনের সাথে দেখা হল। আল্লাহ ওনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। উনি আমাকে আমাদের বাংলাদেশীদের ঈদের জামাতের কথা জানালেন। সেই ঈদের জামাত থেকেই আমি আমার বোনদের পেয়েছি। আমার নতুন পরিবার পেয়েছি, আলহামদুল্লিাহ সুম্মা আলহামদুল্লিাহ

২০১২ সালের এই অন্যরকম রামাদ্বানে আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা আমাকে এমন সব নিয়ামত দান করেছেন, (আমি আমার রবকে চিনতে পেরেছি আলহামদুল্লিাহ) যার কাছে আমার সব কষ্ট ফিকে পড়ে গেল। সব একাকীত্ব খারাপ না.....

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার শীতল ভূখন্ডে হেরার আলো

সালমান ইবনে সিদ্দিক ও ডঃ মুহাম্মদ এহছানুল হক

নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের লীলাভূমি স্ক্যান্ডিনেভিয়া। উত্তর ইউরোপের ধনাঢ্য ও প্রশান্তিতে সময়ের তালে তালে এগিয়ে চলা পাঁচটি দেশ নিয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়া। দেশগুলোর নামও বেশ গালভরা: সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ড। এক যুগের জলদস্যু হিসেবে খ্যাত এখানকার দীর্ঘদেহী নর-নারীরা আজ মানবেতিহাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এক একটি সমাজ গড়েছে এখানে।

গ্রীষ্মের নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া, বসন্তের চেরী, আর শীতের শুভ্র তুষারে ঢাকা চারিদিক, এভাবেই এক এক বর্ণে ও রূপে আসে এক একটি ঋতু এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ায়। হিমেল হাওয়া, সবুজ বন-বনানী, মেঘের উপরে সাদা বরফের টুপি পরে মাথা উচু করে দাড়িয়ে থাকা পাথুরে পর্বতমালা, উত্তাল নীল সমুদ্র, এগুলোই অংঙ্কন করেছে পৃথিবীর সুন্দরতম এই দেশগুলোর ভূচিত্র।

আমার জানালার ধারে আজ চেরী ফুলগুলো সৌন্দর্যে নেয়ে কেপে কেপে উঠছে মিষ্টি রোদের সাথে হিমেল হাওয়ায়। আমি লিখতে বসেছি, কীভাবে অপার সৌন্দের্যের উত্তর ইউরোপের এই শীতল প্রান্তের দেশগুলোতে বিকশিত হচ্ছে হেরার আলো। এখানকার

আদিবাসী ভাইকিং (জলদস্যু) জনগোষ্ঠী প্রথম ইসলামে ও ইসলামী সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয় মুসলিম ব্যবসায়ীদের সাথে বাণিজ্যের মাধ্যমে। গবেষণায় জানা যায়, ৭০০ থেকে ১১০০ শতাব্দীতে মুসলিম পরিব্রাজকদের সংস্পর্শে এসে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দীর্ঘদেহী ও সাহসী জনগোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণের স্বাদ পায়। যদিও তারও অনেক পরে ১৮০০ শতকে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মুসলমানরা প্রথম এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে।

স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে ইসলামের পরিপূর্ণ বিকাশ শুরু হয় মূলত পঞ্চাশের দশকে। এখানে জন্মহার কম, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজন অনেক। আধুনিক মজবুত অর্থনীতির এই দেশগুলোর শ্রমবাজারে তাই সবসময়ই এসে ভীর জমিয়েছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষিত ও যোগ্য মানুষরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ইউরোপ আবার জেগে উঠছিল স্বমহীমায়, তখন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার শ্রম বাজারগুলোর চাহিদা পূরণে এগিয়ে আসে অভিবাসীরা। পরবর্তীতে মুসলিম দেশগুলো থেকে মুসলিম অভিবাসীদের একটা বড় স্রোত বয়ে যায় স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে। এর প্রধান কারণ ছিল আরব দেশগুলোতে বহিঃশক্তিগুলোর প্ররোচনায় চলতে থাকা যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধগুলো। বর্তমানে সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কে ইসলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এবার বলি জগদ্বিখ্যাত শিল্পী মাহের জেইন (Maher Zein) এর দেশ সুইডেনের কথা। আয়তনের দিক দিয়ে সুইডেনের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের বৃহত্তম রাষ্ট্র এবং জনসংখ্যা ১ কোটির কিছু বেশি। ৫০-৬০ এর দশকে সুইডেনের অর্থনীতি সমৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে যা অভিবাসীদের আকৃষ্ট করতে থাকে। শুরুতে দেশটির মুসলিম সম্প্রদায়ে গৃহযুদ্ধের কারণে পালিয়ে আসা তুর্কি ও যুগোস্লাভিয়ান মুসলিমদের আধিপত্য দেখা যায়। পরবর্তীতে পশ্চিম আফ্রিকা, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরান ও ইরাক থেকে আসা শরনার্থীরা সুইডেনের মুসলিম সম্প্রদায়ের বিস্তৃত লাভে সাহায্য করেছে। এখানে মুসলিমদের রয়েছে শত শত মসজিদ, দাতব্য সংস্থা (Charity), কমিউনিটি স্কুল, ইত্যাদি। হরেক রকমের কার্যক্রমের সমাহারে এখানকার মুসলিম সমাজ ধারণ করছে এক রঙ্গিন চিত্র। অনেক আদিবাসী সুইডিশ নাগরিকরাও আকৃষ্ট হচ্ছেন আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের দিকে। এখানকার বাঙ্গালী মুসলিমদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'সুইডিশ মুসলিম এইড' সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলেছে।

নরওয়ের জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লাখ এবং বেশিরভাগ প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান। ১৯৬০ সাল ও তার পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা বড় সংখ্যায় নরওয়েতে আসতে শুরু করে। নরওয়ের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পাকিস্তানী অভিবাসীদের আধিক্য দেখা যায়। ১৯৭৫ এর পরে ইরান, ইরাক ও সোমালিয়ার শরণার্থীরা নরওয়ের মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে প্রায় দুই লক্ষ মুসলিমের বসবাস নরওয়েতে।

দ্বীপরাষ্ট্র ডেনমার্কের জনসংখ্যা প্রায় ৫৮ লাখ। যদিও দেশটিতে প্রায় ৬২.৯% ইভাঞ্জেলিকাল খ্রিস্টান রয়েছে অধিকাংশ ডেনিশ নিজেদেরকে নাস্তিক বা সংশয়বাদী দাবি করতে বেশি পছন্দ করে। ১৯৬০-৭০ এর দশকে যুগোস্লাভিয়া, তুরস্ক ও পাকিস্তান থেকে অধিকাংশ মুসলমানদের আগমন ঘটে শ্রম বাজারের চাহিদার আলোকে। তাছাড়া লেবানন, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান ও সিরিয়া থেকে অদ্যবধি প্রচুর মুসলিম শরণার্থী ডেনমার্কে পা রেখেছে। ডেনমার্কেও মুসলিমদের রয়েছে নানা রং ও রূপের কাজ। এখানকার আদিবাসী ড্যানিস মুসলিম আব্দুল ওয়াহিদ পিটারসেনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ড্যানিশ মুসলিম এইড এখানকার একটি অন্যতম আলোকিত কাজ।

এবার আমি গল্প বলি দুঃখের। যদিও ইসলাম বিস্তৃতি বেশ ভালোভাবেই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলকে প্রভাবিত করেছে এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে ইসলাম এই অঞ্চলে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়, মুসলিম জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হওয়ার নজিরও রয়েছে। ডেনমার্ক থেকে প্রকাশিত 'দ্যা লোকাল' এর একটি প্রতিবেদন বলছে, সুইডেনে অনেক সোমালি মুসলিম তাদের সন্তানদেরকে মৌখিক বা শারীরিক লাঞ্ছনায় শিকার হওয়ার ভয়ে স্কুলে পাঠাতে ভয় পান। কর্মক্ষেত্রেও মুসলিমরা মুখোমুখি হন যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ না পাওয়া কিংবা সহকর্মীদের বিরুপ দৃষ্টিভঙ্গির। রয়টার্সের অনুসন্ধান অনুযায়ী ডেনমার্কে মৌখিক লাঞ্ছনা বা হেট ক্রাইমের ব্যাপারোভিযোগ করা মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিবেদনটি আরও বলে, অনেক মুসলিমই মনে করেন যোগ্যতা থাকা বা যথেষ্ট শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তারা সমাজের চোখে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হন না। ডেনমার্কে খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মের সাংবিধানিক মর্যাদা থাকলেও এদেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনসংখ্যার ধর্ম ইসলামকে এই মর্যাদা এখনো দেওয়া হয়নি। নরওয়েতে মুসলামনদের প্রতি হেট ক্রাইমের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। সেখানে মসজিদে গুলির ঘটনা ও পবিত্র কুরআন শরীফ পোড়ানোর ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম বা মুসলমানদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মানুষদের পাশাপাশি, ইসলামের নুরের ব্যাপারে অজ্ঞতা এবং ইসলামের সৌন্দর্যের ব্যাপারে মুক, অন্ধ বা বধিরতা প্রদর্শনকারী জনগোষ্ঠীও এই অঞ্চলে বিদ্যমান।

আজ এই একবিংশ শতকের উত্তরাধুনিক যুগে ইসলাম স্বমহিমায় স্থান করে নিচ্ছে উত্তর ইউরোপের এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলে। এখানে যেমন রয়েছে মুসলিমদের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য, তেমনি রয়েছে উজ্জ্বল ও রঙ্গিন সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিপুল সমাহার। ইসলাম ও মুসলমানরা স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকলেও, এখনো সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে রয়েছে বৈষম্য। এক্ষেত্রে মুসলমানদের অধিকার আদায়ের সচেতনতা ও সরকারগুলোর সদিচ্ছাই পারে মিষ্টি মধুর সমাধানের মাধ্যমে প্রশান্তির বার্তাবাহী হেরার রশ্মিকে ছড়িয়ে দিতে এখানকার প্রতিটি কোণে।

পবিত্র রামাদান উপলক্ষ্যে
কেন্দ্রীয় সভাপতির আহ্বান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি, আপনারা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। পবিত্র রামাদান মাস আবারও আমাদের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি আশা করি, আল্লাহ পাক এবার আমাদের লকডাউনমুক্ত একটি পরিবেশে রামাদান অতিবাহিত করার সুযোগ দেবেন। আবারও আমরা মসজিদে বড়ো জামাআতে শরীক হতে পারবো। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সাথে মিলে ইফতারি করার সুযোগ পাবো। পবিত্র রামাদান এবং ঈদুল ফিতর উদযাপনের অংশ হিসেবে একে অপরের বাসায় গিয়ে নিজেদের ভাতৃত্বের বন্ধনটুকু সুসংহত করতে পারবো। আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি কেননা তিনি আমাদেরকে রামাদান পর্যন্ত হায়াত দান করেছেন এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদ (সা.)এর উম্মত হিসেবে উপহার ও নেয়ামত স্বরূপ আমাদেরকে রামাদান মাসটি দান করেছেন যাতে আমরা রহমত, বরকত ও নাজাত লাভ করতে পারি। তাই আসুন, এ মাসে আমরা স্বাভাবিক মাসের তুলনায় ইবাদত ও জিকিরের পরিমাণ দ্বিগুন বাড়িয়ে দেই। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন আমাদের যাবতীয় চেষ্টা কবুল করে নেন এবং আমাদেরকে তার প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা এরকমই নিশ্চয়তা দিয়ে আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

“আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে। তাদের জানিয়ে দিন- বস্তুতঃ আমি রয়েছি তাদের খুবই নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, দুআ করে তখন আমি তা কবুল করে নেই। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি সংশয়হীন ঈমান ধারণ করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।” (সুরা বাকারা: আয়াত ১৮৬)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমরা আল্লাহর প্রতি কতটা অনুগত হতে পারলাম, মানবতার কল্যাণে নিজেদেরকে কতটা নিয়োজিত করতে পারলাম, এই আত্ম-পর্যালোচনাটুকু আমাদের করা প্রয়োজন। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের চরিত্র, আচার ব্যবহার কি বিশাল এই স্বীকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন? আমাদের অবস্থান আরো উন্নত করার জন্য বাড়তি আর কী করা প্রয়োজন? আসুন, এই মাসটিকে আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কাজে লাগাই। আল্লাহ আমাদের সব চেষ্টা ও প্রয়াস কবুল করে নিন। আমিন।

রামাদান মাসের ফজিলত:

রামাদান হলো একমাত্র মাস যার নামটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সা.)বলেছেন, “রামাদান মাস শুরু হলে, জান্নাতের দরোজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরোজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকল পড়িয়ে রাখা হয়।” রাসূল (সা.)আরো বলেছেন, “৫ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ এবং এক রামাদান থেকে অন্য রামাদানের মধ্যবর্তী সকল সাগীরা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।”

যারা রামাদান মাসকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলো না, রাসূল (সা.)তাদের সমালোচনা করেছেন এবং এই ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন, “যে ব্যক্তি রামাদান মাস পেলো কিন্তু তার গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারলো না বরং দোজখে প্রবেশ করলো, আল্লাহও তার থেকে দূরেই অবস্থান করেন।”

এই মাসটি আরো একটি কারণে ব্যতিক্রম। কারণ এই মাসে কুরআন নাজিল হয়েছে। তাছাড়া এই মাসে যে রোজা রাখা হয় কিংবা অন্যান্য যে নেকআমলগুলো করা হয়, আল্লাহ তার সাওয়াব বহুগুনে বাড়িয়ে দেন। তাই রামাদান মাসটি হলো চরিত্র গঠনের বিরাট সুযোগ। এই মাসে ভালো ভালো আমল করে এবং বেশি বেশি ইবাদত করার মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেদের উন্নতিও ঘটাতে পারি।

সাওম: উপবাস

এই মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ইবাদত হলো উপবাস থাকা। একটি হাদীসে কুদসী থেকে জানা যায়, “আদম সন্তানের প্রতিটি ভালো কাজের প্রতিদান ১০ থেকে ৭শ গুন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে আল্লাহ বলেছেন, এক্ষেত্রে রোজাই হলো ব্যতিক্রম। কেননা রোজা কেবলই আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেবো। কারণ একজন রোজাদার শুধুমাত্র আমার জন্যই খাবার ও যাবতীয় প্রবৃত্তি থেকে সংযত থাকে।”

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, রোজা মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বিরত রাখে। রাসূল (সা.)বলেছেন, “রোজাদার ব্যক্তি যদি সততার সাথে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোজা রাখে তাহলে প্রতিটি রোজার বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন তার কাছ থেকে ৭০ বছর দূরে সরে যায়।” নবিজি (সা.)আরো বলেছেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রামাদান মাসের রোজা রাখে এবং আল্লাহর কাছ থেকেই এর পুরস্কার প্রত্যাশা করে আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেন। জান্নাতের একটি দরোজা আছে- যার নাম হলো রাইয়ান। শেষ বিচারের দিনে প্রশ্ন করা হবে,

তোমাদের মধ্যে কারা নিয়মিত রোজা রাখতে? তারা এ দরোজা দিয়ে প্রবেশ করবে। এভাবে সর্বশেষ রোজাদার মানুষটি এই দরোজা দিয়ে প্রবেশ করার পর দরোজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।"

যেকোনো পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে রোজা রাখার বিষয়টি আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গই রোজায় অংশগ্রহণ করে। আমাদের চোখ, জিহবা, কান, পাকস্থলী, গোপনাঙ্গ, হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সর্বোপরি আমাদের শরীর, মন এবং আত্মাও রোজার উপবাসে সম্পৃক্ত থাকে এবং পাপাচার থেকে দূরে অবস্থান করে। তাই রোজার সময় আমাদেরকে অবশ্যই অযথা কর্থাবার্তা, তর্ক-বিতর্ক, মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, মিথ্যা শপথ করা এবং বাজে ভাষা প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারো ক্ষতি করা যাবে না, কারো প্রতি অনৈতিকভাবে বা বেআইনী পন্থায় কুদৃষ্টিও দেওয়া যাবে না।

রাসূল (সা.)বলেছেন, "রোজা মানেই কেবল খাওয়া ও পানাহার থেকে বিরত থাকা নয়, বরং অযথা ও অযাচিত কথা বলা থেকে বিরত থাকাও রোজার অপরিহার্য দাবি। কেউ যদি রোজাদারকে অপমান করে কিংবা কোনো ধরনের জুলুম করে তাহলে রোজাদার শুধু বলবে, "আমি রোজা রেখেছি, আমি রোজাদার।" একজন রোজাদারের জন্য রামাদান মাসের দিনটি বছরের অন্যান্য দিন থেকে একদমই আলাদা হবে। রাসূল (সা.)আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি রোজা রেখেও অযাচিত কথা বলা এবং মন্দ কাজ করা বন্ধ করতে পারলো না, খাবার ও পানীয় থেকে তার উপবাসেরও কোনো প্রয়োজন আল্লাহর নেই। (অর্থাৎ এ ধরনের ব্যক্তির রোজা আল্লাহ কবুল করবেন না।)"

কুরআন তেলাওয়াত:

আমরা প্রায়ই শুনি যে, রামাদান হলো কুরআন নাজিলের মাস। এ কারণে এই মাসে কুরআন নিয়েই আমাদের আবিষ্ট থাকা প্রয়োজন। আমাদের পূর্বসরী নেককার বান্দাগন কুরআন নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকতেন যে রামাদানের এক মাসে তারা কয়েকবার কুরআন খতম করতেন। ইসলামের একজন কর্মী হিসেবে আমাদেরও অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করার চেষ্টা করা উচিত। সহীহ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা কোনো ছাড় দেবো না। মনে রাখতে হবে যে, রাসূল (সা.)বলেছেন, রোজা ও কুরআন শেষ বিচারের দিনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে। রোজা সেদিন বলবে, "হে আল্লাহ আমি তাকে খাবার ও প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখতে পেরেছিলাম। তাই আমাকে তার পক্ষে সুপারিশ করতে দিন। অন্যদিকে, কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে ঘুমুতে দেইনি। সে রাত জেগে আমাকে তেলাওয়াত করেছে। তাই আমাকেও তার পক্ষে সুপারিশ করতে দিন। এভাবে কুরআন ও রোজা দুজনেই রোজাদারের জন্য সুপারিশ করবে। তাই আমাদেরও দুআ করা উচিত, "হে আল্লাহ কুরআনকে আমাদের জীবনের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী বানিয়ে দিন। কবরের দীর্ঘ যাত্রায় আমাদেরকে স্বস্তিদায়ক বন্ধু দিন। গোটা জীবনকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করে দিন। কুরআনের বদৌলতে জান্নাতে আমাদেরকে উত্তম সঙ্গী দান করুন। কুরআনকে আমাদের হেফাজতের এবং জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষার পাথেয় করে দিন।

কিয়ামুল লাইল: রাত্রি জাগরন:

রাসূলুল্লাহ (সা.)ঘোষণা করেছেন, "যে ব্যক্তি রামাদানের রাতগুলো দৃঢ় ঈমানের সাথে ইবাদতের মধ্য দিয়ে পার করে এবং একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রতিদান প্রত্যাশা করে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় আর যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরের রাতটি ইবাদতে পার করে এবং এ জন্যেও কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রতিদান আশা করে তারও অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। রামাদান মাসটি হলো কিয়ামুলের মাস; তাই এ মাসে আমরা যেন কিয়ামুল লাইল আমল না করে এই মাসের কোনো রজনী পার না করি।

সাদাকাহ:

রামাদান মাস হলো ব্যয়ের মাস। এই মাসে রাসূল (সা.)প্রবাহমান বাতাসের মতো নিরন্তরভাবে দান করতেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) সকল মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি উদার ছিলেন। আর রামাদানে তার উদারতা অন্য সব মাসকে ছাড়িয়ে যেতো। অনেক মুসলিম রামাদানের শেষদিকে দরিদ্র মানুষের মাঝে জাকাতের অর্থ প্রদান করেন। জাকাতের বাইরেও এমন অনেক ক্ষেত্রেই আছে যেখানে নিয়মিত আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয়। এই খাতগুলোতেও আমরা রামাদান মাসে সার্বিক সহযোগিতা জারি রাখতে পারি।

রাসূল (সা.)গোটা রামাদান মাস জুড়েই উদারতার অনুশীলণ করতেন। তবে যখন জিবরাইল আ. তার সাথে সাক্ষাতে আসতেন, তিনি আরো বেশি উদার হয়ে যেতেন। রামাদানের প্রতি রাতেই জিবরাইল আ. নবিজির (সা.)কাছে আসতেন এবং রাসূলের (সা.) সাথে বসে গোটা কুরআনটি একবার তেলাওয়াত করতেন। এই সাক্ষাতের পর রাসূল (সা.)যেন উচ্চগতির বাতাসের মতো আরো বেশি দানশীল ও উদার হয়ে যেতেন।

দুআ:

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্নিত। রাসূল (সা.)বলেছেন, "তিন বান্দার দুআ কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। প্রথমত সেই বান্দা যিনি মাত্র রোজা সম্পন্ন করেছেন। দ্বিতীয়ত, ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম বা নেতা এবং তৃতীয়ত সেই ব্যক্তি যার ওপর জুলুম করা হয়েছে। মজলুম এই ব্যক্তির দুআ আল্লাহ মেঘের ওপর তুলে নিয়ে যান এবং তার জন্য জান্নাতের দুয়ার খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন, "আমার শক্তিমত্তার কসম। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো। হয়তো কিছু সময় পর।" এ কারণে আমাদেরকে দুআ করার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগানো উচিত। বিশেষ করে ইফতারের সময়, প্রতি ওয়াক্ত ফজর নামাজের সময়, আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, সিজদাহ'র সময় এবং রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুআর পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

আসুন, আমরা রামাদানের জন্য একটি টেকসই পরিকল্পনা প্রনয়ন করি। আসুন আমরা আমাদের সময়গুলো পরিপূর্নভাবে এবং কার্যকরভাবে কাটানোর চেষ্টা করি। সব ধরনের অপ্রয়োজনীয় ও অযাচিত কর্মকান্ডগুলো বন্ধ করি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপ্রয়োজনে সময় দেওয়া থেকে বিরত থাকি। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাওফিক দিন যাতে আমরা আসন্ন রামাদান মাসের পুরোটা সময় ইবাদতে অতিবাহিত করতে পারি। আমিন।

আপনাদের দ্বীনি ভাই
মোসলেহ ফারাদী
কেন্দ্রীয় সভাপতি

সংগঠন সংবাদ

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন এম সি এর ২০২১-২০২৩ সেশনের ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং সেক্রেটারিয়েট গঠন সম্পন্ন

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সেশনের প্রথম শুরা কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন তাদের ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং সেক্রেটারিয়েট গঠন সম্পন্ন করেছে।

অধিবেশনে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন:

১. মোসলেহ ফারাদী
২. হামিদ হোসাইন আজাদ
৩. হাবিবুর রহমান
৪. দেলোয়ার হোসেন খান
৫. আতিকুর রহমান জিলু
৬. আইয়ুব খান
৭. আব্দুল্লাহিল মামুন আল আজমি
৮. শেখ আব্দুল কাইয়ুম
৯. আবুল হোসেইন খান
১০. নূরুল মতীন চৌধুরী
১১. আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনূস
১২. নেসার আহ্মেদ
১৩. হাসান কাউছার আহমেদ
১৪. আব্দুল মুমিন
১৫. ডক্টর আব্দুল্লাহ ফলিক
১৬. রাহেলা চৌধুরী
১৭. আঞ্জুমান আরা বেগম বিউটি
১৮. রওশন আরা কবীর
১৯. আবুল কাহির দিলদার হোসেন চৌধুরী
২০. সৈয়দ এহতেশামুল হক
২১. মনজুর আহমেদ
২২. রাইসুল ইসলাম রাসেল
২৩. রেজাউল করিম চৌধুরী
২৪. সৈয়দ জামিরুল ইসলাম
২৫. সৈয়দ তোফায়েল হোসেন
২৬. সৈয়দ কাহির উদ্দিন
২৭. মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন
২৮. আনসার মুস্তাকিম
২৯. সালেহ আহমেদ
৩০. ইমদাদ উল্লাহ মাহবুব
৩১. সমির উদ্দিন
৩২. রাজু মোহাম্মদ শিবলী
৩৩. মোহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ
৩৪. মনোয়ার হোসেন

কেন্দ্রীয় সভাপতি পর্যায়ক্রমে শুরা কাউন্সিল মনোনয়ন, জেনারেল সেক্রেটারি এবং অফিস বিয়ারার ঘোষণা এবং ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলের নির্বাচন সম্পন্ন করেন।

কেন্দ্রীয় সভাপতি ৬ জন ভাই এবং ৬ জন বোনকে শুরা কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কো-অপট করেন। তারা হলেন:

১. ডক্টর আশরাফ মাহমুদ
২. মুস্তাক আহমেদ
৩. এফ কে শাহজাহান
৪. মোসাদ্দিক আহমেদ
৫. সিরাজুল ইসলাম হিরা
৬. মাহফুজ নাহিদ
৭. সালমা সিদ্দিকা
৮. ফেরদৌস আরা
৯. শিরিন সুলতানা
১০. আসমা খান
১১. আফিয়া বেগম শিকদার
১২. আয়েশা খানম।

এরপর কেন্দ্রীয় সভাপতি সকলের সাথে পরামর্শ করে জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে হামিদ হোসাইন আজাদ, ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে নুরুল মতীন চৌধুরী এবং বায়তুলমাল সম্পাদক হিসাবে মোস্তাক আহমেদ কে মনোনীত করেন।

ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন:

১. আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনূস
২. আব্দুল মুনিম
৩. ড. মাহেরা রুবি
৪. দেলোয়ার হোসেন খান
৫. ডক্টর আশরাফ মাহমুদ
৬. হাবিবুর রহমান
৭. হাসান কাউছার আহমেদ
৮. হাসান সিরাজ সালেকীন
৯. মামুন আল আজমি
১০.মুস্তাক আহমেদ
১১. নেসার আহমেদ
১২. নুরুল মতীন চৌধুরী
১৩. রাহেলা চৌধুরী
১৪. ডা. মাহেরা রুবি ।

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ:

১. মোসলেহ ফরাদী - কেন্দ্রীয় সভাপতি
২. হামিদ হোসাইন আজাদ- জেনারেল সেক্রেটারি
৩. নুরুল মতীন চৌধুরী- ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি
৪. মুস্তাক আহমেদ - ফাইন্যান্স সেক্রেটারি
৫. আতিকুর রহমান জিলু - নতুন নতুন এলাকায় কাজ সৃষ্টি করা
৬. নেসার আহমেদ- বির সেক্রেটারি

কেন্দ্রীয় বিভাগ সমূহঃ

১. হাফেজ আবুল হোসেইন খান - দাওয়াহ
২. নুরুল মতীন চৌধুরী - জামায়াহ
৩. মামুন আল আজমি - তারবিয়াহ
৪. নেসার আহমেদ- বির
৫. মাহফুজ নাহিদ- আদল

কেন্দ্রীয় সভাপতি রিজিওন এবং ব্রাঞ্চগুলোর নির্বাচনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

জাতিসংঘের বর্ণবাদ বিরোধী দিবসকে সামনে রেখে লন্ডনে ১৯ মার্চ ২০২২ March Against Racism অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন সংগঠন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষের সাথে মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের ভাইয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বশীল, লন্ডনের বিভিন্ন রিজনাল সভাপতি, রিজিয়নের জাস্টিস সেক্রেটারিদের উপস্থিতিতে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে এমসিএর ভাইয়েরা রিফুজি, ইসলামোফোবিয়া, সিটিজেন বর্ডার বিল সংক্রান্ত নানা ধরনের প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন প্রদর্শন করেন।

সাদা আর কালোতে, জাতি আর ধর্মের নানা বর্ণবাদী বৈষম্যে নিপীড়িত হয়েছেন, সহিংসতায় প্রাণ দিয়েছেন অগণিত মানুষ। আবার এই বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামেও প্রাণ দিতে হয়েছে অগণিত মানুষকে। কিন্তু দুনিয়া থেকে এখনও বর্ণবৈষম্য দূর হয়ে যায়নি। আমাদের অবশ্যই এমন একটি বিশ্বের জন্য কাজ করতে হবে যা কেবল বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নয় বরং সক্রিয়ভাবে বর্ণবাদবিরোধী। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য এমসি এর জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

লন্ডন নর্থ ইস্ট রিজওন এর ইস্ট ব্রাঞ্চ এর বির কার্যক্রমের একটি অন্যতম সংযোজন হল দারুল আরকাম মসজিদ ভিত্তিক একটি ফুড ব্যাংক চালু করন। সংশ্লিষ্ট সকলে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে এটি আলোর মুখ দেখেছে। ভাই ও বোনেরা সবাই সহমর্মিতা দেখিয়ে যাচ্ছেন। এসব কাজের প্রেরণা আসে নিম্নের আয়াত সমুহ থেকে।

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ(٢٩:٣)

কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যদি কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানে

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ (٥:٢)

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর।

উল্লেখ্য যে এ ফুড ব্যাংকের মাধ্যমে বহুমুখী কাজের দ্বার খুলেছে যেমন কমিউনিটি সুইচিং করে আমাদের সসিয়াল কমিটমেন্টে ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। ভাই-বোনদের মধ্যে ইহসান শিক্ষার একটা প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করছে এটি। সর্বোপরি মানবতার কল্যাণে কাজ করার যে তাকিদ কুরআন-হাদীস এ এসেছে তার একটা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে ও এ ফুড ব্যাংক সুযোগ করে দিয়েছে।

আরেকটা বিষয় এখানে না উল্লেখ করলে অত্র রিজওনের কল্যাণকামী ভাই বোনদের প্রতি অবিচার করা হবে তা হল এই যে বিগত কোভিড ক্রান্তিকালীন সময়ে

অত্র ক্যাচম্যানট এরিয়ার আওতাধীন এলাকায় যে সকল ভাই বোনদের অসুস্থতার খবর আমাদের নিকট এসেছে সেখানেই সাধ্যানুসারে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে হয়েছে এবং এটা চলমান আছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চালু রাখার তৌফিক দান করুন।

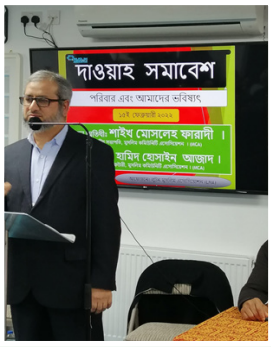

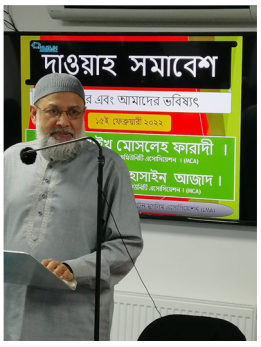

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়শন, লুটন শাখা কর্তৃক আয়োজিত ‘দাওয়াহ্ সমাবেশ’ সুসম্পন্ন

করোনা মহামারিজনিত কঠোর বিধি-নিষেধের কারণে দীর্ঘদিন ধরে লুটনে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের নিয়ে বড় ধরনের কোন সভা-সমাবেশ করা যাচ্ছিল না। অবশেষে গত ১৫-ই ফেব্রুয়ারি ২০২২’ইং মঙ্গলবার বাদ এশা মহান আল্লাহ পাকের অশেষ দয়া আর মেহেরবানিতে লুটনের হকওয়েল রিং জামে মসজিদে বহুল কাঙ্খিত সমাবেশ সফলতার সাথে সুসম্পন্ন হলো, আলহামদুলিল্লাহ।

‘পরিবার এবং আমাদের ভবিষ্যৎ’ এই বিষয়কে সামনে নিয়ে মসজিদ ভর্তি বিপুল সংখ্যক ইসলাম প্রিয় জনতার উপস্থিতিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের লুটন শাখা সেক্রেটারি আশরাফুল হক খান রুমানের পরিচালনায় ও হযরত আলী (রাঃ) ইউনিটের তারবিয়া সেক্রেটারি মাওলানা সিদ্দিকুর রহমানের মনোমুগ্ধকর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় সমাবেশ, এতে সভাপতিত্ব করেন লুটন শাখা সভাপতি জনাব আবুল কালাম।

উক্ত দাওয়াহ্ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়শন-এর মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি শায়েখ মোসলেহ উদ্দিন ফারাদী ও বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়শন -এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল জনাব ব্যারিস্টার হামিদ হুসেইন আযাদ। আরোও বক্তব্য রাখেন মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়শন এর ইস্ট রিজিয়নের সভাপতি জনাব সৈয়দ তোফায়েল হুসেইন, ইস্ট রিজিয়নের সেক্রেটারি ও মসজিদের চেয়ারম্যান জনাব শরিফুর রহমান, স্থানীয় সংগঠনের অভিভাবক ও হকওয়েল রিং মসজিদের প্রধান খতিব মাওলানা ফখরুল ইসলাম এবং রিজিয়নের ইংলিশ উইং প্রেসিডন্ট মুহিত মিয়া।

প্রধান অতিথির আলোচনার মূল বিষয় ছিল, মুসলিম পরিবারগুলো পশ্চিমা সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে কীভাবে দিনদিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য প্রত্যেকে কীভাবে নিজ নিজ পরিবারে ইসলামের সঠিক চর্চার মাধ্যমে ইসলামিক পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিবারে ও সমাজে শান্তি ফিরিয়ে এনে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারেন।

সমাবেশে চমৎকার সব ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন ইস্ট রিজিয়নের বায়তুলমাল ও সংস্কৃতি সম্পাদক এহসান আহমদ চৌধুরী ফুয়াদ, ওয়াহিদুল ইসলাম ও উদীয়মান শিল্পী বায়জীদ আল বান্না। এসব জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠে গাওয়া ইসলামি সংগীতগুলো ছিল সমাবেশের বাড়তি আকর্ষণ।

সর্বশেষে সভাপতি জনাব আবুল কালাম সমাবেশে উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং আলোচকদের আলোচনার শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বাস্তব জীবনে আমল করার উদাত্ব আহ্বান জানিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাংস্কৃতিক কর্মশালা

বিদেশে জন্মগ্রহণ করা ছেলে-মেয়েদের মাঝে কীভাবে আমাদের সাংস্কৃতিকে জিইয়ে রাখা যায় সেই নিমিত্তে ইয়ং এবং বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি পূর্ব লন্ডনে আমাদের পরবর্তী জেনারেশন নিয়ে দিন ব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন থিম নিয়ে তাৎক্ষনিক নাটিকা উপস্থাপন করা হয়। সফল কর্মশালা শেষে সবাইকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। বর্তমানে ইউরোপ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপ এর কাজ সমাদৃত। আশা করা যায় আপনাদের ভালবাসা সাথে নিয়ে ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপ অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি

ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপ ইউরোপের সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক সংগঠন। ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজ অবধি এই সংগঠন টি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের চিত্ত বিনোদনের খোরাক জোগান দিয়ে আসছে। শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে প্রোগ্রাম করা ছাড়াও ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইসলামিক সংস্কৃতি উপস্থাপন করে থাকে। বর্তমান আধুনিক সংস্কৃতির ইসলামিক বিকল্প হওয়ায় মুসলিম ভাই বোনদের মাঝে এই সংগঠনটি অত্যধিক জনপ্রিয়। এই দলে কাজ করে বাংলাদেশের মঞ্চ কাঁপানো শিল্পীরা, এমনকি বাংলাদেশে তিনবার স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত শিল্পীও রয়েছে এখানে। গান, কবিতা, নাটকসহ ইসলামিক সংস্কৃতির অনেক বিভাগ নিয়ে এরা কাজ করে। আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবন ধারাকে যুক্তরাজ্যের মাটিতে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াসে বর্তমানে ম্যসেজ কালচারাল গ্রুপ পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এর সাথে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২১ সালেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপ পূর্ব লন্ডনের ব্রাডি আর্ট সেন্টারে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মূলক নাটক নিয়ে অংশগ্রহণ করে। এই দেশে জন্মগ্রহণ করা ছেলে মেয়েদেরকে সাথে নিয়ে অসাধারণভাবে নাটকটি উপস্থাপন করা হয়। বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ফুটিয়ে তোলার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা মানুষের প্রশংসা কুড়ায় ।

ইস্ট লন্ডন রিজিয়নের উদ্যোগে তারবীয়াহ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত। প্রধান অতিথি ছিলেন শায়খ মুসলেহ ফারাদী। বিশেষ অতিথি নুরুল মতীন চৌধুরী, হাফিজ এরশাদ উলাহ।

সুইস রিজিয়নের উদ্যোগে গত ১৪ অক্টোবর ২০২১ খ্রি. রাস্তায় দাওয়াতী কাজ করা হয়।

এমসিএ, লন্ডন সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে পরিচালিত নিয়মিত যুব কর্মসূচি।

লন্ডন সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে তরুণদের নিয়ে শিক্ষা সফর।

লন্ডন সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে বরফ পরিষ্কার কর্মসূচি।

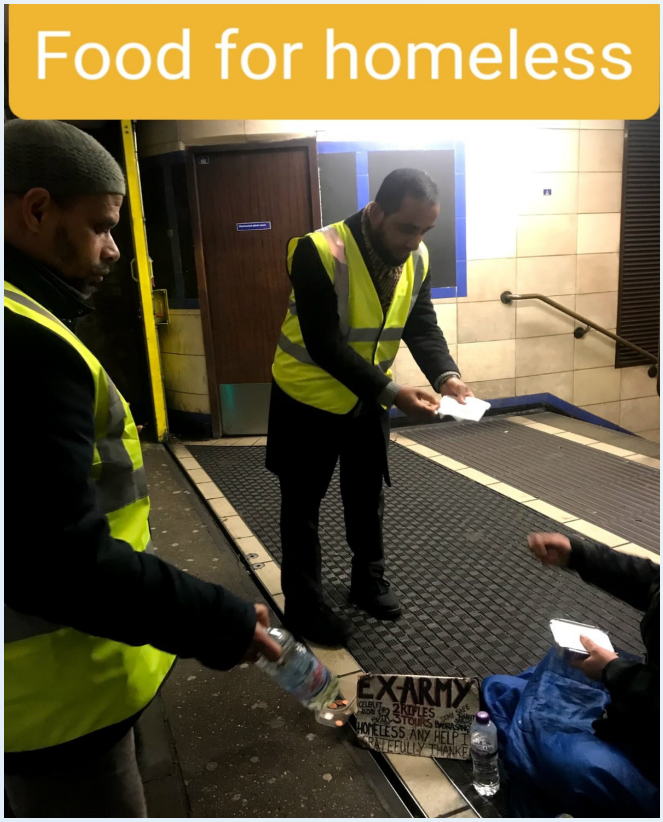

লন্ডন সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে গৃহহীনদের মাঝে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি।

কেন্ট ব্রাঞ্চের উদ্যোগে রামাদ্বানের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও স্কলার অধ্যাপক মফিজুর রহমান।

শুরার সদস্য ভাইদের নিয়ে শিক্ষাশিবির।

শেফিল্ড মুসলিম সোসাইটি (এসএমএস) এর উদ্যোগে অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতি কাজ।

লন্ডন ইস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে অমুসলিমদের জন্য দাওয়াহ স্টল।

লন্ডন ইস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে ইয়ুথ সার্কেল অনুষ্ঠিত।

লন্ডন ইস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

ট্রেন্ট বেলাল মসজিদে সামষ্টিক ভোজ অনুষ্ঠিত